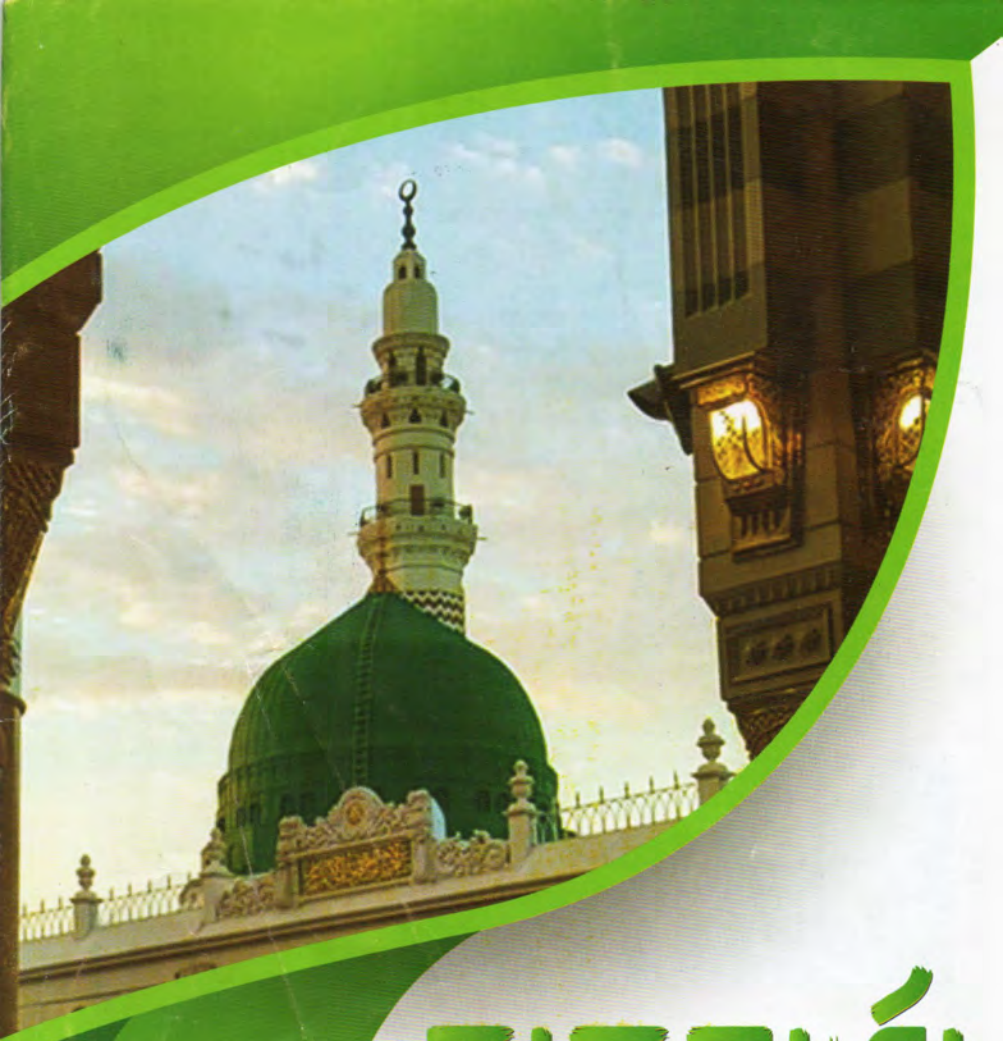

ছাত্রবার্তা

রবিউল আউয়াল সংখ্যা, ২০২২

Chattrasenacentral
www.chattrasena.org
chattrasenacentral@gmail.com

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি:
মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন আহমদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে:
আব্দুল্লাহ আল জাবের

অন্তর্বর্তীকালীন সম্পাদক:
মুহাম্মদ আদনান তাহসিন আলমদার
মুহাম্মদ আজাদ হোসাইন
মুহাম্মদ নূরের রহমান (রণি)

সার্কুলেশন:
মুহাম্মদ নুর রায়হান চৌধুরী
হাফেজ মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন

প্রচ্ছদ:
আ.ল.ম. হুমাইর কাইসান

বর্ণবিন্যাস:
তারিফ হোসেন

প্রকাশনায়:
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা
২০৭ (তৃতীয় তলা), ১ নং গলি,
ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
sahityosena@gmail.com

মুদ্রণে:
গ্রাফিক্স বাজার,
কে.এম. ভবন ২য় তলা,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৪৩-৯৬৭৪৮৫

ছাত্রবার্তা

মিলাদুন্নবী ﷺ সংখ্যা

সূচীপত্র

কোরআনের বার্তা ——— ০৩
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল ফোরকানী

হাদিসের বার্তা ——— ০৬
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম

একান্ত সাক্ষাৎকারে-
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট মহাসচিব
সেহাব উদ্দিন মুহাম্মদ আবদুস সামাদ ——— ১১

জশনে জুলুস'র ৫০ বছর ——— ১৪
মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

দ্বীনের পথে সর্বোচ্চ ত্যাগ-ই হোক
আমাদের অঙ্গীকার ——— ১৬
মুহাম্মদ আনোয়ার শাহাদাত হোসেন

ফারুকী আন্দোলন: ছাত্রসেনার ভূমিকা ——— ১৯
মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন রব্বানী

রাসুলুল্লাহ (ﷺ)'র কয়েকটি মুজিজা ——— ২৪
মুফতি মুহাম্মদ আনিসুর রহমান রিজভি

মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর
শরাব পান প্রসঙ্গে একটি নিরপেক্ষ
পর্যালোচনা (দ্বিতীয় পর্ব) ——— ৩০
হাসান মুহাম্মদ কফিলুদ্দীন

আসন্ন অর্থনৈতিক মন্দা ও বাংলাদেশ ——— ৩৩
শাহবাজ আসাদুল্লাহ

আকিদা সুরক্ষার ব্যবস্থাপনাপত্র ——— ৩৭
মুহাম্মদ আবদুল করিম

আল্লামা শাহ আহ্‌মাদ নূরানী
সিদ্দিকী رحمة الله عليه'র
ঐতিহাসিক প্রস্তাবনা : ——— ৩৯
ইরফান যিয়ায়ী

দেশে দেশে মিলাদুন্নবী ﷺ'র
নানান আয়োজন ——— ৪১
আবু মুহাম্মদ মুশফিক ইলাহী

নারী অধিকার ও রাসুল (ﷺ) ——— ৪৪
সাবিনা চৌধুরী

কবিতা/ছড়া ——— ৪৬

সাধারণ জ্ঞান ——— ৪৮

বার্তা ——— ৪৮

উৎসর্গ

হুজুর পুরনুর, আক্বা-এ তাজেদার, রহমতুল্লিল আলামীন,
শফি'আল মুজনিবীন, আক্বা

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

ইমামুত তরিক্বত খাজা শায়খ

বাহাউদ্দীন নক্সবন্দী বুখারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)

শিক্ষকের প্রতি কর্তব্য

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল ফোরকানী

যেমন আমি তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছি একজন রাসুল তোমাদের মধ্য থেকে (মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ), যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও পরিপক্ক জ্ঞান শিক্ষা দেন। আর তোমাদের সেই শিক্ষা দান করেন, যার জ্ঞান তোমাদের ছিল না। *(সুরা বাকারা: আয়াত:১৫১,কানযুল ঈমান)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

পৃথিবী যখন ধ্বংসের মুখে উপনীত; মাদক-সন্ত্রাসী, পশুত্ব, চরিত্রহীনতা, সুদখোরী, লুটপাট, ছিনতাই, অর্থলিপ্সা, নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা যখন গোটা দুনিয়াকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল, ঠিক সে মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা রহমতে আলম ﷺ-কে শিক্ষকরূপে এ বসুন্ধরায় প্রেরণ করেছেন। প্রেরিত হয়েছিলেন মানবতার মুক্তির সনদ নিয়ে। রাসুলে করিম ﷺ দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'বুইছতু মুয়াল্লিমান'। অর্থাৎ, "এই বিশ্বজগতে আমি প্রেরিত হয়েছি শিক্ষকরূপে।" সমস্ত নবীদেরকে এই পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল মানবপ্রেম, ভালোবাসা, সেবা, কল্যাণ ও মানবতার শিক্ষায় মানুষকে মানুষ রূপে গড়ে তোলা। সে মিশন নিয়ে কাজ করেছেন নবী-রাসুলগণ। পিতা সন্তানকে জন্ম দেন আর শিক্ষক তাকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। তাই শিক্ষককে বলা হয় সন্তানের দ্বিতীয় বাবা। শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয় তবে শিক্ষক হলেন সেই মেরুদণ্ড গঠনের প্রাণশক্তি। শিক্ষক হলেন সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণের কান্ডারি। তিনজনই পারে একটি দেশ বা জাতিকে বদলাতে। তারা হলেন বাবা, মা ও শিক্ষক। ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ১৪৫টি দেশের সুপারিশের মাধ্যমে ইউনেস্কো'র কাছে শিক্ষকদের জন্য 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস'র দাবি তোলা হয়। এই দাবি বাস্তবায়ন হওয়ার পর থেকে প্রতিবছর ৫ অক্টোবর পালিত হয় শিক্ষক দিবস।

শিক্ষকের মর্যাদা:

(ক) সৃষ্টিকুল যার জন্যে দোয়া করে: সুনানে তিরমিজির বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ শিক্ষকের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, "কল্যাণকর বিদ্যা দানকারীর জন্য সবাই (প্রাণী ও প্রকৃতি) আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করে"। ইবনে মাজাহ এর অন্য হাদিসে এসেছে, "সর্বোত্তম দান হলো কোনো মুসলমান নিজে কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে পরে তা অপর মুসলমান ভাইকে শিক্ষা দেয়"।

(খ) শিক্ষক সবার সেরা: ইসলামের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ বদরের যুদ্ধে কাফেরদের ৭০জন যোদ্ধা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। রাসুলে করিম ﷺ সবার সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন, এ বন্দীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হবে। এক হাজার দিরহাম হতে ৪ হাজার দিরহাম পর্যন্ত সামর্থ অনুযায়ী বন্দীদের মুক্তিপণ হবে। যারা ভালো অবস্থাসম্পন্ন ছিল, তাদের জন্য ছিল চার হাজার দিরহাম। আর যারা অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল ছিল, তাদের জন্য দুই-তিন বা এক হাজার দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু যারা নিঃস্ব, গরীব তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, প্রত্যেকে মদিনার দশজন বাচ্চাকে পড়ালেখা শিখাবে। যখন এসব বাচ্চারা পড়তে ও লিখতে শিখে যাবে, তখন তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। মদিনার বাচ্চাদেরকে পাঠদান করানোর বিনিময়ে বন্দিদের মুক্তি দিয়ে নবী করিম ﷺ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, "শিক্ষকদের মর্যাদা অতুলনীয়"। বাংলা ভাষার অন্যতম কবি কাজী কাদের নেওয়াজ 'শিক্ষকের মর্যাদা' নামে একটি মর্মস্পর্শী কবিতা লিখেছেন। কবিতায় শিক্ষকের আদব ও সেবা সম্পর্কে জাতির নিকট খুব সুন্দর করে তুলে

ধরেছেন। কী রাজা, কী বাদশাহ, কী এমপি; কিছুই তুলনা নাই শিক্ষকের সাথে। শিক্ষক-ই মহান, তিনি সবার সেরা।

কবি তার কবিতার ছত্রে-ছত্রে মহান করে তুলেছেন শিক্ষা গুরুকে। "কহিলেন আমি ভয় করি নাক/ যায় যাবে শির টুটি/ শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার/ দিল্লির পতি সে তো কোন ছার..।" কবিতাটি শেষ করলেন এভাবে "আজ হতে চির উন্নত হলো/ শিক্ষা গুরুর শির,/ সত্যিই তুমি মহান উদার বাদশাহ আলমগীর।"

(গ) ছাত্র শিক্ষকের অধীন: মাওলা আলী ﵁ বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে একটি হরফ বা অক্ষর শিক্ষা দিল, আমি আলী তার গোলাম হয়ে গেলাম। তিনি ইচ্ছে করলে আমাকে বিক্রি করে দিতে পারে। আমাকে গোলাম হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবে। ইচ্ছে করলে আজাদ করতে পারবে।

(ঘ) ছাত্র শিক্ষকের নিকট আসা বাঞ্চনীয়: রাসুলে করিম ﷺ-র চাচাতো ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা রাসুলে করিম ﷺ এঁর ইন্তেকালের সময় মাত্র ১৩ বছর বয়সী ছিলেন। তাঁর এই বয়সে তিনি ছিলেন মদিনা মুনাওয়ারার শিক্ষক, বসরার শিক্ষক। বয়সের শেষ সময়ের শিক্ষক ছিলেন মসজিদে হারামের। পাঠদানে তাঁর একটা নিজস্ব রুটিন ছিল। সপ্তাহে একদিন ফেকাহ পড়াতেন; একদিন পড়াতেন তাফসীর; একদিন পড়াতেন ইতিহাস; একদিন পড়াতেন আরবের কবিতা। আকাশসম জ্ঞানের উচ্চতায় তিনি কীভাবে পৌঁছলেন! কী ছিল তাঁর মুজাহাদা, ইলমের জন্য ব্যতিব্যস্ততা। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেন, "আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-র একটি হাদিসের জন্য সাহাবায়ে কেরামের দুয়ারে-দুয়ারে ধর্ণা দিয়েছি বহুদিন। দিন-দুপুরে, সকাল-সন্ধ্যায়, এমনকি রাতের গভীরেও। একদিন দুপুরে এক সাহাবীর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, তিনি ঘুমাচ্ছেন। তখন তাঁর দরজার সামনে গায়ের চাদরটাকে বিছানা বানিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাতাস পথের ধুলি উড়িয়ে এনে দেয় আমার নাকে-মুখে, শরীরে। যথাসময়ে তাঁর ঘুম ভাঙলে ঘর হতে বের হয়ে আমাকে শায়িত দেখে অবাক হয়ে বললেন, "হে নবীজির চাচাত ভাই, আপনি কেন এসেছেন? খবর দিলে আমি তো নিজেই চলে আসতাম"। আমি তখন উত্তরে জানাই, না, "আপনি আমার শিক্ষক। ছাত্র-শিক্ষকের নিকট আসা বাঞ্চনীয়""। নবীজীর চাচাতো ভাই উস্তাদের ঘরের দরজায় মাটিতে শুয়ে থাকতে দ্বিধা করেননি। করেননি লজ্জাবোধ।

(ঙ) শিক্ষকের প্রতি সম্মান: বাদশাহ হারুনুর রশিদ তাঁর পুত্রকে পড়তে পাঠালেন ভাষাবিজ্ঞানি ইমাম আসমাইর কাছে। একদিন বাদশাহ লক্ষ করলেন ইমাম আসমাই ওযু করছেন, আর শাহজাদা পানি ঢালছেন। এই দৃশ্য দেখে বাদশাহ ব্যথিত হলেন এবং ইমাম আসমাইকে বললেন, "আমি আমার ছেলেকে আপনার নিকট ইলম ও আদব শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছি। সুতরাং, আপনি তাকে এক হাতে পানি ও অপর হাতে পা ধুয়ে দিতে বললেন না কেন? পুত্র বিশাল সাম্রাজ্যের শাহজাদা হলেও শিক্ষকের প্রতি আন্তরিক আদব ও সশ্রদ্ধ বিনয় ছাড়া বড় হতে পারে না"।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী ﵀ ছিলেন একজন মহান ইমাম। তৎকালীন বাদশাহ তাঁকে খুব সম্মান করতেন। একবার তিনি বললেন, "আল্লাহ তায়ালা আমাকে অনেক সম্মান দিয়েছেন। তার একমাত্র কারণ উস্তাদের খেদমত। আমি ৩০ বছর পর্যন্ত আমার উস্তাদ কাযী ইমাম আবু দাউদ দাদুসি র﵀-র খেদমত করেছি। করেছি রান্না-বান্নার কাজ। কিন্তু তা থেকে আমি কিছুই খাইনি"।

শিক্ষকের কর্তব্য: পৃথিবীখ্যাত আব্রাহাম লিংকন তাঁর নিজ সন্তানকে শিক্ষালয়ে প্রেরণের সময় শিক্ষককে চিঠি লিখেন, "আমার পুত্রকে জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করলাম। তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন এটাই আপনার নিকট আমার দাবি। আমার পুত্রকে শেখাবেন-সব মানুষই ন্যায়পরায়ণ নয়, সত্যনিষ্ঠ নয়। তাকে এও শেখাবেন, প্রত্যেক বদমায়েশের সঙ্গেও একজন বীরপুরুষ থাকতে পারে। প্রত্যেক স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতার মাঝেও একজন নিঃসার্থ নেতা থাকে। তাকে শেখাবেন, পাঁচটি ডলার কুড়িয়ে পাওয়ার চেয়ে একটি ডলার উপার্জন অনেক উত্তম। এও তাকে শেখাবেন কীভাবে পরাজয় মেনে নিতে হয়, কীভাবে বিজয় উল্লাস করতে হয়। হিংসা থেকে দূরে থাকার শিক্ষাও তাকে দেবেন। যদি পারেন নিরব হাসির গোপন সৌন্দর্য তাকে শেখাবেন। সে যেন আগেভাগেই বুঝতে পারে, যারা পীড়নকারী তাদেরই সহজে কাবু করা যায়। বইয়ের মাঝে কী রহস্য লুকিয়ে আছে তাও তাকে শেখাবেন। তাকে শেখাবেন বিদ্যালয়ে নকল করার চেয়ে ফেল করা অনেক সম্মানের। নিজের ওপর যেন সুমহান আস্থা থাকে, এমনকি সবাই যদি সেটাকে ভুলও মনে করে। তাকে শেখাবেন ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্র আচরণ, কঠোরদের প্রতি কঠোর হতে। আমার পুত্র যেন শক্তিই পায়। হুজুগে মাতাল জনতার যেন অনুসরণ না করে। যেন সবার কথা শুনে, তা সত্যের পর্দায় ছেকে যেন ভালটাই গ্রহণ করে এ শিক্ষা তাকে দেবেন। সে যেন দুঃখের মাঝে কীভাবে হাসতে হয়, এবং কান্নার মাঝে লজ্জা নেই একথা শিখে। যারা নির্মম ও নির্দয় তাদেরকে ঘৃণা করতে শেখে। আর অতিরিক্ত আরাম-আয়েশ থেকে বিরত থাকে। আমার পুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করবেন। কিন্তু সোহাগ করবেন না। কেননা আগুনে পুড়েই ইস্পাত খাঁটি হয়। আমার সন্তান যেন অধৈর্য্য হওয়ার সাহস না রাখে। রাখে যেন সাহসি হওয়ার ধৈর্য্য। তাকে এও শিক্ষা দেবেন নিজের প্রতি যেন সুমহান আস্থা থাকে, তখনই তার সুমহান আস্থা থাকবে মানবজাতির প্রতি। ইতি, আপনার আব্রাহাম লিংকন।"

শিক্ষক আজ উত্তম আদর্শ হওয়ার পরিবর্তে সর্বপ্রকার মন্দ ও ফিতনা-ফাসাদের পতাকাবাহীতে পরিণত হচ্ছে। যাবতীয় অপকর্মের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিতসহ অনিয়ম-অনাচার, বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অধঃপতনের দৃশ্যমান নৈরাজ্য চলছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। নিয়ম-শৃঙ্খলার কোনো বালাই নেই। মানবতা ও নৈতিকতা পরিণত হয়েছে পঁচা লাশে। আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠছে। শিক্ষক-প্রফেসর, উপাচার্য্যের কর্মকাণ্ড, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতিসহ রয়েছে নানামাত্রিক অনেক অভিযোগ। শিক্ষক ছাত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে চরিত্রগত অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে বেহায়ার মতো। তাই উন্নত শিক্ষার্থী ও জাতি গঠন করতে হলে একজন শিক্ষককে অবশ্যই আদর্শ ও নৈতিকতার অধিকারী হতে হবে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন- "নৈতিকতার বিচারে যে লোক উত্তম মুমিনদের মধ্যে সে-ই পূর্ণ ঈমানের অধিকারী।" *(সুনানে তিরমিজি)*

পরিশেষে বলা যায় -শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপর। একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রভাবে আদর্শ শিক্ষার্থী ও উন্নত জাতি গঠন সম্ভব। একটি প্রবাদ আছে : "Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher", অর্থাৎ- "হাজার বছর নিরলস অধ্যাবসায় হতে একজন ভাল শিক্ষকের কাছে একদিন বসা উত্তম।" তাই আসুন আমরা শিক্ষকের মর্যাদা যথাযথ আদায় করি।

লেখক: আরবি প্রভাষক, মাদরাসা এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী), বন্দর, চট্টগ্রাম।

হাদিসের বার্তা

মুমিনের জীবনে ঈদ

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম

হযরত আবু ক্বাতাদাহ ﵁ বর্ণনা করেন, "রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সোমবারে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সেদিন আমার জন্ম হয়েছে, আমি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি এবং আমার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।" *(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬০৬)*

রাবী পরিচিতি:

হযরত আবু কাতাদাহ ﵁ মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনী সুলামা শাখায় ৬০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর প্রকৃত নাম নু'মান মতান্তরে আমর। ইতিহাসে তিনি আবু কাতাদাহ নামেই খ্যাত। পিতা রাব'য়ী ইবনে বালদামা এবং মাতা কাবশা বিনতে মুতাহ্হির। দ্বিতীয় আকাবার পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি উহুদসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসুলুল্লাহর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৭০। তিনি ৩৮/৪০/৫৪ হিজরি সনে ৭০/৭২ বছর বয়সে কুফা মতান্তরে মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন। হযরত আলী ﵁ তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। *(সীরাতে ইবনে হিশাম, ২/৪৪৮, ৪৪৯; হায়াতুস সাহাবা,২/৯০, ৯১;আল ইসাবা, ৪/১৫৮)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

আলোচ্য হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ স্বীয় বেলাদত দিবসের ব্যাপারে খুব খুশি ছিলেন এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে রোযা রেখেছিলেন। রোযা রাখা এক ধরনের ইবাদত; সুতরাং যেকোনো ধরনের ইবাদত পালন করে এই দিনকে উদযাপন করা যায়। কেউ রোযা রাখতেও পারেন, আবার মিলাদের মাহফিল (নবীজির জীবনী আলোচনা) করতেও পারেন; কেননা এগুলোর সবই ইবাদত। তিনি জন্মদিন উপলক্ষ্যে রোজা রাখার মাধ্যমে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন। সুতরাং, আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন করা রাসুলুল্লাহর সুন্নাত। ইরশাদ হচ্ছে- "হে নবী! আপনি বলুন, মুসলমানগণ আল্লাহর ফযল ও রহমত পাওয়ার কারণে যেন নির্মল খুশি ও আনন্দোৎসব করে। এটা তাদের যাবতীয় সম্পদ থেকে উত্তম।" উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাস্‌সির হযরত ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, "ফযল ও রহমত দ্বারা নবী করিম ﷺ ই উদ্দেশ্য। সুতরাং, নেয়ামতপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে শুকরিয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন বৈধ অনুষ্ঠান করাই কোরআনের নির্দেশ।" *(তাফসীরে রুহুল মায়ানী, সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৮)*

বছরে ঈদ কয়টি? এ প্রসঙ্গে ইমাম তাবরানী মুজামুল আওছাতে বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন- "زَيِّنُوْا اَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيْرِ", অর্থাৎ, "তোমরা তোমাদের ঈদগুলোকে তাকবীর-ধ্বণি দ্বারা সৌন্দর্য্যমণ্ডিত কর।" আলোচ্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ আ'ইয়াদ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর আ'ইয়াদ শব্দটি ঈদ শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ একটি ঈদকে আরবীতে বলা হয় ঈদুন, দু'টি হলে ঈদানে আর দু'য়ের অধিক ঈদকে বলে আ'ইয়াদ। অতএব নবী করীম ﷺ-র এ শব্দ চয়নই প্রমাণ করে ঈদ দু'য়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং একাধিক।

কুরআন-সুন্নাহ পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয় মু'মিনের ঈদ দিবা-রাত্রি সর্বমোট ৯টি। যথাঃ

১. ঈদুল ফিতর ও ২. ঈদুল আযহা: সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হাদিসে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, "জাহেলিয়াতে দুটি দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদেরকে দুটি উত্তম দিন প্রদান করেছেন;

ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন।"

৩. ঈদে আরাফা: জামে তিরমীযির বর্ণিত হাদিসে হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "সুরা মায়েদার ৩নং আয়াত যে দিন নাযিল হয়েছে ঐদিন একসাথে দুই ঈদ ছিলো- ক. জুমুআর দিন এবং খ. আরাফার দিন!"

৪. ঈদে জুমুআ: সুনানে ইবনে মাজাহ এ বর্ণিত হাদিসে হাবীবুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এই জুমুআর দিনকে মুসলিমদের ঈদের দিনরূপে নির্ধারণ করেছেন।" হাদিসের ভাষ্যমতে, হযরত আদম ﷺ জুমুআর দিন সৃষ্টি, দুনিয়ায় আগমন, ইন্তেকাল করার কারণে দিনটি এতটাই শ্রেষ্ঠ যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার চাইতেও বেশি মর্যদাবান ও ঈদের দিন।

৫. ঈদে শবে বারাআত ও ৬. ঈদে শবে কুদর: এ প্রসঙ্গে গুনিয়াতুত তুলেবীনে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "লাইলাতুর বরাত ও লাইলাতুল কদর ফিরিশতাদের উনাদের ঈদের দিন।"

৭. ঈদে আশুরা: সুরা বাক্বারাতে ১০ মহরম মুসা ﷺ ও বনী ঈসরাইলগণ নীলনদ পার হওয়া এবং প্রতি বৎসর এ উপলক্ষ্যে আশুরার রোযা ও ঈদ পালন করার কথা হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে।

৮. ঈদে নুযুলে মায়েদা: সুরা মায়েদায় রয়েছে, হযরত ঈসা ﷺ বলেন- "হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাযিল করুন। এ দিন আমাদের জন্য ঈদ হবে। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্যও তা হবে ঈদের দিন।"

৯.ঈদে মীলাদুন্নবী: বনী ঈসরাইলের উপর আল্লাহর রহমত তথা মুসা ﷺ ও বনী ঈসরাইলগণ নীলনদ পার হওয়া এবং ঈসা ﷺ ও হাওয়ারীদের জন্য আকাশ থেকে আল্লাহ কর্তৃক যিয়াফত হিসেবে মায়েদা নাযিলের স্মরণে যদি প্রতি বৎসর ঐ দিনে ঈদ পালন করা যায়, তাহলে আল্লাহর ঘোষণা মোতাবেক শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত রাসুলে করিম ﷺ-র আগমন দিবসে প্রতি বৎসর ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ পালন করা যাবে না কেন? কুরআন-হাদিসের বর্ণনা মতে নিঃসন্দেহে এটা সওয়াবের কাজ। সুতরাং, শরীয়তে অসংখ্য ঈদ থাকার পরও যারা বলে দুই ঈদ ব্যতীত অন্য কোন ঈদ নাই তারা রাসুলুল্লাহর হাদিস অস্বীকারকারী, নবীজীর প্রতি মিথ্যারোপ কারী। সহিহ বুখারীতে বর্ণিত হাদিসে রাসুলে আরবি ﷺ বলেন, "যে আমার নামে মনগড়া মিথ্যা কথা বললো, সে দুনিয়ায় থাকতেই তার স্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিলো।"

আনন্দিত হওয়ার সুফল: ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী ﷺ ইমাম সুহাইলী আলাইহির রাহমাহ থেকে বর্ণনা করেন- হযরত আব্বাস ﷺ বলেন, "আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বছর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি যে, সে খুব খারাপ অবস্থায় আছে। অতঃপর সে বলল, তোমাদের ছেড়ে আসার পর আমি কোন শান্তি পাইনি; তবে প্রতি সোমবার আমার শাস্তি কিছুটা কমানো হয়।" (ইমাম সুহাইলি বলেন) "কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, আর আবু

লাহাবের দাসী ছুয়াইবা রাসুলুল্লাহর জন্মগ্রহণের সুসংবাদ আবু লাহাবকে দিলে সে তাকে আনন্দিত হয়ে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়।" এ হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনুয জাযরী ও শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা বলেন- "এ হাদিস ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনকারী এবং এর জন্য সম্পদ ব্যয়কারীদের প্রতিদান প্রাপ্তির প্রমাণ।" আবু লাহাব, যার নিন্দায় কুরআনের একটি সূরা (লাহাব) অবতীর্ণ হয়েছে, সে যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ-র জন্মের ওপর খুশি হয়ে তার দাসী (ছুয়াইবা) কে স্বাধীন করে দেয়ার কারণে শাস্তি কম ভোগ করে, তাহলে সে মুসলিমের কী অবস্থা হবে, যে রাসুলুল্লাহর ভালবাসা নিয়ে 'ঈদে মিলাদুন্নবী' উদযাপন করে এবং ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনে সম্পদ ব্যায় করে? তবে মন্দ বিদয়াত যেমন নাচ, গান, হারাম বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা উচিত; কেননা এগুলোর কারণে (মিলাদুন্নবী উদযাপনের) বরকত পাওয়া যাবে না। *(সহিহ বুখারী, ২/ ৭৬৪ পৃ.; ফতহুল বারী শরহে বুখারী, ৭/ ১২৫ পৃ.;মাদারিজুন নবুয়ত, ২/২৬ পৃঃ)*

পানাহারের আয়োজন করা যাবে কি? হযরত আনাস ﷺ বর্ণনা করেন, নবুয়ত প্রকাশের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই নিজের আক্বীক্বা করেছেন। এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বিশ্ববিখ্যাত ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "রাসুলুল্লাহ ﷺ-র দাদা আবদুল মুত্তালিব নবীজির জন্মের সপ্তম দিনে রাসুলুল্লাহর আকিকা করেছেন"। অথচ আক্বীক্বা দু'বার হয় না। সুতরাং, রাসুলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয়বার যে আক্বীক্বা করেছেন, তা ছিল আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' এবং উম্মতের কাছে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। এভাবে রাসুলুল্লাহ আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে নিজের ওপর দরুদ শরীফও পাঠ করতেন। অতএব রাসুলুল্লাহর জন্ম উপলক্ষ্যে মুসলিম ভাইদের একত্রিত করার মাধ্যমে খানা খাওয়ানো, অন্যান্য ইবাদত পালন ও ঈদ উদযাপনের মাধ্যমে আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করা আমাদের জন্যও মুস্তাহাব।

নবী-সাহাবী মিলাদুন্নবী পালন করেছেন কী?:

১.নবী করিম ﷺ নবুয়ত পরবর্তীকালে নিজেই সাহাবীদেরকে নিয়ে নিজের মিলাদ সম্পর্কে আলোকপাত (তথা মিলাদুন্নবীর মাহফিল) করেছেন। হযরত ইরবায ইবনে ছারিয়া ﷺ একদিন হুযুর পুরনূর ﷺ-কে তাঁর আদি বৃত্তান্ত বর্ণনা করার জন্য আরয করলে রাসুলে করিম ﷺ ইরশাদ করেন- "আমি তখনও নবী ছিলাম- যখন আদম ﷺ এঁর দেহের উপাদান - মাটি ও পানি পৃথক-পৃথক অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ, আদম নবীর সৃষ্টির পূর্বেই আমি নবী হিসেবে মনোনীত ছিলাম। আমাকে হযরত ইবরাহীম ﷺ-র দোয়ার বরকতে তাঁর বংশে প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং, আমি তাঁর দোয়ার ফসল। হযরত ঈসা ﷺ তাঁর উম্মতের নিকট আমার আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই আমার সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। আমার জননী বিবি আমেনা আমার প্রসবকালীন সময়ে যে নূর তাঁর গর্ভ হতে প্রকাশ পেয়ে সুদূর সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত করতে দেখেছিলেন, আমিই সেই নূর । *(মিশকাত শরীফ)*

২.হযরত আবু দারদা ﷺ বলেন, "আমি একদিন নবী করীম ﷺ-র সাথে আনসারী সাহাবী আবু আমের ﷺ-র গৃহে গমন করে দেখতে পেলাম- তিনি তাঁর সন্তানাদি ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করে নবী করীম ﷺ -র পবিত্র বেলাদত সম্পর্কিত জন্ম বিবরণী (তথা মিলাদুন্নবীর মাহফিল) শিক্ষা দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, "আজই সেই পবিত্র জন্ম তারিখ।..." এই মাহফিল দেখে রাসুলে

ﷺ খুশী হয়ে তাঁকে সুসংবাদ দিলেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য (মিলাদের কারণে) রহমতের অসংখ্য দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাগণ তোমাদের সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন"। *(সাবিলুল হুদা; আত তানভীর)*

৩.একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ নিজগৃহে মিলাদ মাহফিল (তথা মিলাদুন্নবীর মাহফিল) অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। উপস্থিত সাহাবাগণের নিকট নবী করিম ﷺ-র পবিত্র বেলাদত সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণনা করছিলেন। শ্রোতামণ্ডলী শুনতে-শুনতে মীলাদুন্নবীর আনন্দ উপভোগ করছিলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও নবীজির দরূদ পড়ছিলেন। এমন সময় রাসুলে করিম ﷺ সেখানে উপস্থিত হয়ে ইরশাদ করলেন, "তোমাদের সকলের প্রতি আমার সুপারিশ ও শাফাআত অবধারিত হয়ে গেল।" সুবহানাল্লাহ! *(আদ দুররুল মুনাযযাম)*

৪.সাহাবী কবি হযরত হাসসান বিন সাবিত ﵁ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নবী করীম ﷺ-র উপস্থিতিতে তাঁর গৌরবগাঁথা পেশ করতেন এবং অন্যান্য সাহাবীগণ সমবেত হয়ে তা শ্রবণ করতেন। যা শুনে মুগ্ধ হয়ে নবীজি তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন। *(মিশকাত শরীফ)*

মিলাদুন্নবী ও সিরাতুন্নবী: মিলাদুন্নবী ও সিরাতুন্নবী হল ব্যাপক আলোচিত শব্দ। শাব্দিক অর্থে মিলাদুন্নবী দ্বারা নবী করীম ﷺ-র শুভাগমন এবং সিরাতুন্নবী দ্বারা রাসুলে আরবি ﷺ-র চরিত্র বুঝালেও ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় উভয় শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। ইমাম নাসাফী ﵀ বলেন, "জিহাদ তথা যুদ্ধের কর্মপদ্ধতির নাম হল সিরাত। তাই সিরাতুন্নবী নবী করীম ﷺ-র ৮ বৎসরে যুদ্ধ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত; নবীজির জিহাদী জিন্দেগীর অংশের নাম।" (হিদায়া; কাওয়াঈদুল ফিকহ) পক্ষান্তরে মিলাদুন্নবী হল রাসুলুল্লাহর আদি বৃত্তান্তের নাম। নবী করীম ﷺ-র নুরী জগতের সৃষ্টি হতে শুরু করে নুরানী জগতে লক্ষ-লক্ষ বৎসর বিচরণ, তারপর দুনিয়ার বুকে শুভাগমন ও দুধপান করার অবস্থা থেকে ৬৩ বছর নুরানী জাহেরি হায়াতে তৈয়্যবার প্রতিটি বিষয় আলোচনায় স্থান পায় মিলাদুন্নবীর মাহফিলে বা অনুষ্ঠানে। কোন-কোন কুচক্রী মহল মিলাদুন্নবীর বিশাল আয়োজনকে সহ্য করতে না পেরে ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বরকতময় ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ-র নুরানী মাহফিল থেকে মুসলমানদের দূরে সরানোর অপচেষ্টা হিসেবে সিরাতুন্নবী মাহফিলের অবতারণা করেছে। তাদের উদ্দেশ্য হল নবীপ্রেমিক মুমিনদের সাথে ঈদে মিলাদুন্নবীর সাথে সংঘর্ষ ও বিরোধিতা করা এবং মিলাদুন্নবী ﷺ-র প্রতি আঘাত ও কটূক্তি করা। এ প্রসঙ্গে মুফতী আমীমুল ইহসান বরকতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে সীরাত বলতে ভাল-মন্দ উভয় চরিত্র বুঝায়। বস্তুত নবী করিম ﷺ-র অনুপম চরিত্রে মন্দের লেশ মাত্রও নেই। তাই সীরাতুন্নবী শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ নয়। তদুপরি সীরাতুন্নবী মাহফিল নামে কোন অনুষ্ঠান অতীত যুগে ছিল না। তাই নব্য বিদআত।" যুগ-যুগ ধরে বিশ্বের মুসলমানগণ রবিউল আওয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ নামে নবীজির শুভাগমনকে অতি ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে পালন করে আসছেন। ইসলামী শরীয়তের মুফতিগণ বিশেষত মক্কা-মদীনার ৯০ জন শীর্ষস্থানীয় আলেম ১২৮৬ হিজরীতে এটাকে বরকতময় ও মুস্তাহাব হিসেবে চূড়ান্ত ফায়সালা দিয়ে নিম্নোক্ত ফতোয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রেরণ করেছেন। "হে মুসলমানগণ! আপনারা জেনে রাখুন যে, মীলাদুন্নবী ﷺ-র আলোচনা ও তাঁর সমস্ত শান-মান বর্ণনা করা এবং ঐ মাহফিলে উপস্থিত হওয়া সবই সুন্নাত। যা প্রকৃত ওলামায়ে কেরাম ও আউলিয়া কেরামের অনুসৃত তরিকা। তাছাড়া বাংলাদেশসহ বর্তমান

বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশে এ দিনটিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা দিয়ে ঈদে মিলাদুন্নবীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপন করছে। আর এর বিপরীত করা মিলাদুন্নবীকে অস্বীকার করার নামান্তর এবং নবী-বিদ্বেষী ও ফিতনাবাজ কুচক্রী মুনাফিকদের চরিত্র হিসেবে প্রতীয়মান। আল্লাহ হিদায়ত নসিব করুক। *(ফতোয়ায়ে হারামাঈন)*

লেখক: আরবী প্রভাষক, রাণীরহাট আল আমিন হামেদিয়া ফাযিল মাদ্রাসা: খতিব, রাজানগর রাণীরহাট ডিগ্রি কলেজ জামে মসজিদ,রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

একান্ত সাক্ষাৎকারে-
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট মহাসচিব
সেহাব উদ্দিন মুহাম্মদ আবদুস সামাদ

সেহাব উদ্দিন মুহাম্মদ আবদুস সামাদ: বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর ২০২২ ইসায়ী ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন হলে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের জাতীয় কাউন্সিলে মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ১৯৬৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ্ব মৌলানা আহমদ বশির ও মাতা মরহুমা আলহাজ্বা রাবেয়া খাতুন। ঐতিহ্যবাহী জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদরাসায় ১৯৭৩ সালে ৮ মার্চ ভর্তির মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম সোবহানিয়া আলীয়া মাদরাসা থেকে দাখিল ও আলিম, দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা থেকে ফাযিল ও ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। পাশাপাশি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্সে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তিনি কলম সম্রাট আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ) এঁর জীবন ও কর্ম বিষয়ের উপর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা সেন্ট্রাল ল' কলেজ থেকে এলএলবি সম্পন্ন করে ঢাকা জজ কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। ৯০ সালের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম এই সংগঠক বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অহিংস ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীতে তিনি ছাত্রসেনার কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক (দুই সেশন), সভাপতির (দুই সেশন) দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালে ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ) নির্বাচনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা মনোনীত প্যানেল সামাদ বখতেয়ার-বাশার পরিষদে ভিপি পদে নির্বাচন করে ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উট-৮৩ ব্যাচের কার্যকরী সদস্য। তাঁর নেতৃত্বে ছাত্রসেনার ব্যানারে ঢাবির মধুর ক্যান্টিনে ১৯৯০ সালে সংবাদ সম্মেলনে সর্বপ্রথম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করা হয়, যা পরবর্তীতে দেশের মানুষের গণদাবীতে রূপ নেয়। তিনি বাংলাদেশ ইসলামী যুবসেনার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বেও ছিলেন। দেশ-জাতির প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইসলামী ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক, যুগ্ম-মহাসচিব, সাংগঠনিক সচিবের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তাঁর উপর মহাসচিব এর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে । তিনি দেশের অন্যতম সেবামূলক সংস্থা আনজুমানে খোদ্দামুল মুসলেমীন এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও বোর্ড অব ট্রাস্টির মেম্বারের দায়িত্বে আছেন। কর্মজীবনে তিনি আইন পেশা ছেড়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হন। চাঁদপুর জেলায় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফরাজীকান্দী ওয়েছিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকতা পেশায়ও তিনি সফলতার সাক্ষর রাখেন। ১৯৯৭ সালে সারাদেশের মধ্যে তিনি জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন। ১৯৯৮ সাল থেকে শিক্ষকতা ছেড়ে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন।

উল্লেখ্য- ছাত্রসেনার রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন সময় উগ্রবাদি ছাত্রসংগঠনের হামলার শিকার হয়েছেন। যুদ্ধাপরাধীদের সংগঠন ছাত্র শিবির কর্তৃক ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম দারুল উলুম

মাদ্রাসায় ও ১৯৮৫ সালে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় হামলার শিকার হন। ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের হাতে হামলাসহ একাধিকবার মামলা-হামলার শিকার হওয়ার পরও এক কালের তুখোড় এ ছাত্রনেতাকে দমানো যায়নি।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই মেয়ে ও এক ছেলের গর্বিত পিতা। জ্ঞানে-গুণে অনন্য, প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ এ সংগঠক, সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ ৮০'র দশক থেকে বর্তমান অবধি সত্য, সঠিক, ন্যায় ও আদর্শের পথে লড়ে যাচ্ছেন অবিরাম। বিগত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি চট্টগ্রাম-৮ বোয়ালখালী চান্দগাঁও, পাঁচলাইশ (আংশিক) সংসদীয় আসনে ও চট্টগ্রাম-১৪ চন্দনাইশ, সাতকানিয়া (আংশিক) সংসদীয় আসনে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট মনোনীত মোমবাতি প্রতীকে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ছিলেন। তখন তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব,গঠনমূলক বক্তব্য, বিচক্ষণতায় ও গণসংযোগে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের চোখের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল। এমন আদর্শিক যোগ্য নেতৃত্বের হাতে দেশ ও জাতি নিরাপদ।

*

সেহাব উদ্দিন মুহাম্মদ আবদুস সামাদ একান্ত সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক নজরুল ইসলাম এর সাথে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। তাঁর সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশ পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

* নজরুল ইসলাম: আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সামাদ ভাই?
*স.উ.ম আবদুস সামাদ: ওয়ালাইকুমাসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল-হামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আশা করি আপনিও ভালো আছেন।

*নজরুল: এখন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মহাসচিব নির্বাচিত হয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রমকে কীভাবে পরিচালনা করছেন?
*সামাদ: মহাসচিব নির্বাচিত হয়ে মাত্র শুরু করলাম, অপেক্ষা করেন। চমক আসবে।

*নজরুল: ভোটের রাজনীতিকে কীভাবে দেখছেন?
*সামাদ: বাংলাদেশে সুষ্ঠু ভোট নির্বাসনে গেছে। দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ ভোটকে যুদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। আমরা ভোটের রাজনীতিতে যুদ্ধের মত হানাহানি, খুনাখুনি, অস্ত্রবাজী দেখতে চাই না। আমরা চাই ভোটকে উৎসবে পরিণত করতে। সকল নাগরিক নিরাপদ ও সাচ্ছন্দ্যে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

*নজরুল: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তো সন্নিকটে, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের ভাবনা কী?
*সামাদ: দেখুন, আমরা আগামী নির্বাচনে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। ইতোমধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা করা হচ্ছে।

*নজরুল: তাহলে আপনারা এককভাবে নির্বাচন করবেন?
*সামাদ: আমাদের নিকট বড় রাজনৈতিক জোটগুলো থেকে জোট করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবনা আসছে। এখনও এ বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিইনি। এখন এককভাবে ৩০০ আসনের প্রস্তুতি চলছে। নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নিয়ন্ত্রনাধিন বড় দু'টি জোট থেকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব আসার পর বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের নীতি নির্ধারণী বোর্ড কোন জোটের সাথে যুক্ত হবে কি হবে না- এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

*নজরুল: দেশের জনগণ ও ভোটারদের উদ্দেশ্যে আপনার বক্তব্য কী?
*সামাদ: আমাদের দেশের জনগণ বর্তমানে ভালো নেই। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও নানা অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়নে জনগণ রীতিমতো অতিষ্ঠ। এর বিরুদ্ধ সঠিক সময়ে পদক্ষপ নেয়ার মাধ্যম হচ্ছে ভোট। মনে রাখতে হবে, ভোট আপনার উপর পবিত্র আমানত। ভোট দেওয়ার অপর নাম রায় দেওয়া। অর্থাৎ আপনি একজন বিচারক। আপনি সুবিচার করবেন, নাকি অবিচার করবেন তা আপনার বিবেকের উপর নির্ভর করে। এজন্য ইহ ও পরকালে আপনাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আপনার রায়ে নির্বাচিত ব্যক্তি যদি এলাকাবাসীর আমানতের খেয়ানত-কারী হয়, জালিম হয়, অযোগ্য হয়, দুর্নীতিবাজ হয় তবে তাকে নির্বাচিত করার জন্য আপনিও দায়ী হবেন। সুতরাং তিনি যেমন প্রত্যক্ষ অপরাধী হবেন, ঠিক তেমনি তাকে নির্বাচিত করার কারণে আপনিও পরোক্ষ অপরাধী হবেন। সুতরাং আপনার রায় যেন আপনাকে অপরাধী না বানায় তা ভালোভাবে বুঝে শুনে তারপরই ভোট দিন।

প্রশ্ন: অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের ব্যাপারে আপনার অভিমত?
সামাদ: প্রতিহিংসার রাজনীতি দেশে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। হিংসাত্মক-ধ্বংসাত্মক রাজনীতির ফলে দেশের অন্যান্য দলের নেতা, কর্মী, সমর্থক কেউ কারো নিকট নিরাপদ নয়। এসব দলের প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উপর নির্যাতন, নিপীড়নের মাধ্যমে প্রতিহিংসার রাজনীতির চর্চা করে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত ও সুফবাদী অহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাসী। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনতা এই দলের নিকট নিরাপদ।

*প্রশ্ন: সুন্নীদের ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?
*উত্তর: ২০০৪ সালে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির কারণে আমাদের সুন্নীদের মাঝে যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা বর্তমানে কাটিয়ে ওঠার কাজ চলছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইতোমধ্যে সবাইকে আপন নীড়ে ফিরে আনার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আমি সর্বস্তরের সুন্নী ওলামা-মাশায়েখ, সুন্নী সংগঠক, নেতাকর্মী ও সুন্নী জনতাকে আহ্বান জানাব, আপনাদের জন্য আমাদের দরজা উন্মুক্ত, ফিরে আসুন আপন নীড়ে।

সংগ্রহ-
ছাত্রবার্তা ডেস্ক

জশনে জুলুস'র ৫০ বছর

মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে, ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) শত-শত বছর ধরে উদযাপিত হয়ে আসছে বিশ্বব্যাপী। আজ থেকে সাতশত বছর আগের বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনীতেও মুসলমানদের দেশে-দেশে ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) পালন তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন বলে উল্লেখ করে গেছেন। এ উপলক্ষ্যে গাজী সালাহউদ্দিন আইউবীর ভগ্নিপতি সুলতান আবু মুজাফফর কুকবুরী ইরাকের ইরবিলে রাষ্ট্রীয়ভাবে যে মহা আয়োজন করতেন, তা আজো ইতিহাসে আলো ছড়াচ্ছে। আজ থেকে অন্তত সাড়ে বারশত বছর আগের লেখক আজরকি (ওফাত ২০০ হি.) তাঁর 'আখবারে মক্কা'-তে সেই সময়ের আরবে ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) উপলক্ষ্যে নানা আয়োজনের কথা বর্ণনা করে গেছেন। আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত বাইশটি দেশের মধ্যে বিশটি দেশেই রাষ্ট্র কর্তৃক এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে আসছে আবহমানকাল ধরে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের অপরাপর দেশেও রয়েছে অনুরূপ বৈচিত্র্যময় কর্মসূচি। তবে, এ উপলক্ষ্যে যতসব আয়োজন এ যাবত বিশ্বময় হয়ে আসছে এরমধ্যে 'জশনে জুলুস' হলো সর্বাধিক জনপ্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। আরবসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) তে দিনদিন শামিল হচ্ছে অসংখ্য ধর্মপ্রান মানুষ। দিনদিন এই জুলুস সেজে আসছে বর্ণাঢ্য আয়োজনে। বাংলাদেশে এমন একটি পরিশীলিত ও আকর্ষণীয় ইসলামি সংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয়েছে রাসুল (ﷺ)'র ৩৯ তম অধঃস্তন, রাসুল (ﷺ)'র বংশের এক উজ্জ্বল তারকা, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশসহ শতাধিক দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের জনক, কাদেরিয়া ত্বরিকার মহান দিকপাল, গাউসে জামান, আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)'র নির্দেশনা ও রুপরেখা অনুসারে। হিজরি ১৩৯৪, (১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ) হতে, সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের কোরবানিগঞ্জ বলুয়ারদীঘি পাড়ের খানকাহ এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া হতে সর্বপ্রথম জশনে জুলুস আত্মপ্রকাশ করে। এ বছর ১৪৪৪ সনের জশনে জুলুস হবে ৫০তম আয়োজন। আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় দেশের প্রথম জশনে জুলুসে নেতৃত্ব দেন আনজুমান ট্রাস্টের তৎকালীন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ আল কাদেরী। আর, ১৯৭৬ (১৩৯৬ হি) সনে এর প্রতিষ্ঠাতা হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্ (র) এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং তিনি নিজেই এই জুলুসে নেতৃত্ব দেন, যা ১৯৮৬ সন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তিনি প্রতিবছর ৯ই রবিউল আউয়াল ঢাকা, এবং ১২ই রবিউল আউয়াল চট্টগ্রামে আয়োজিত জশনে জুলুসে নেতৃত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বে এদেশে 'জশনে জুলুস' লাভ করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা। ১৯৮৬ সনেই এতে লাখো মানুষকে যোগ দিতে দেখা যায়।আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট আয়োজিত এই জশনে জুলুস অনুসরণেই বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, খানকাহ, দরবার, সংগঠন রবিউল আউয়াল মাসে বের করে আসছে দেশব্যাপী শতশত জসনে জুলুস, যা ঈদে মিলাদুন্নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়োজনকে করেছে বর্ণাঢ্য ও জনপ্রিয়, যা সরকারকেও প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকার এ উপলক্ষ্যে ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে সরকারি, বেসরকারি ভবন এবং বিদেশের কূটনৈতিক মিশনগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আদেশ জারি করে 'মিলাদ' অনুষ্ঠানকে আরো বেশি তাৎপর্যমন্ডিত ও ব্যাপকতা দান করেছে, এ জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয়

প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

যা হোক, যখন এ দেশে একটি উগ্রবাদী গোষ্ঠী কোরান- সুন্নাহর অপব্যাখ্যা দিয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) পালনের বৈধতার প্রশ্ন তুলে, দেশব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে হানাহানি সৃষ্টি করে জঙ্গিবাদ কায়েমের বীজ বপনের চক্রান্তে লিপ্ত ছিল, ঠিক সেই সময়ে মহান সংস্কারক আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ হুজুরের 'জশনে জুলুস ' সাধারণ সহজ-সরল মুসলমান ও আলেম-ওলামার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলে। বিরোধিরা শেষতক পিছুটান দিতে বাধ্য হয়, এবং ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) 'জশনে জুলুস'র ওসিলায় দেশব্যাপী জনপ্রিয় হতে থাকে।
আজ জশনে জুলুসের রুপকার আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ হুজুর এই দৃশ্যমান হায়াতে নেই বটে, কিন্তু তাঁর সুযোগ্য সাজ্জাদানশীন শাহজাদা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ হুজুরের হাতে 'জসনে জুলুস' নামক বীজটি বটবৃক্ষ হয়ে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৮৭ থেকে এ পর্যন্ত (মাঝে কয়েকবছর ছাড়া) প্রায় সবকটি জুলুসে নেতৃত্ব দিয়েছেন হুজুর কেবলা তাহের শাহ্ (মা জি আ)। তাঁর নেতৃত্বে আনজুমান ট্রাস্টের এই ১২ রবিউল আউয়াল, চট্টগ্রাম শহরে আয়োজিত জসনে জুলুসে বিগত বছরগুলোতে আনুমানিক প্রায় অর্ধকোটির কাছাকাছি মানুষের অংশগ্রহণ হয়েছে বলে মিডিয়াগুলোতে প্রচারিত হয়েছে। বর্তমানে সচেতন মহল চট্টগ্রামের এই জশনে জুলুসকে বিশ্বের সেরা জশনে জুলুস হিসেবে আখ্যায়িত করছে, এবং এই জুলুসকে বিশ্বঐতিহ্য আখ্যা দিয়ে জাতিসংঘের গিনেজ বুকে স্থান দেওয়ার দাবি ওঠছে কয়েক বছর ধরে। এ দাবি বাস্তবায়ন হলে শুধু ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ)'র ব্যাপৃতি হবে না, বরং চট্টগ্রামও হবে বিশেষভাবে সন্মানিত ও আলোচিত।

আসুন, চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে ১২ রবিউল আউয়াল এবং ঢাকা-মুহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা হতে ৯ রবিউল আউয়াল অনুষ্ঠিতব্য এবারের ৫০তম জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে দলে-দলে যোগদান করি।

লেখক-

মুখপাত্র, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, বাংলাদেশ।

দ্বীনের পথে সর্বোচ্চ ত্যাগ-ই হোক আমাদের অঙ্গীকার

মুহাম্মদ আনোয়ার শাহাদাত হোসেন

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসুল) এই কালেমার প্রতি ঈমান আনার পর কোন মুসলমানের পক্ষে আল্লাহর বিধান মেনে প্রিয় নবী'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা এবং জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দর্শন বা বিধানকে গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে তাঁর খলিফা হিসেবে ঘোষণা দিলেন। মানুষ হল দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি। মানুষের কাজ হলো আল্লাহকে এক 'ইলাহ' হিসেবে মেনে নিয়ে জীবনের সবক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করা। এরশাদ হচ্ছে- "তিনিই তোমাদের করেছেন দুনিয়ার প্রতিনিধি এবং একে-অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। নিঃসন্দেহে আপনার রব শাস্তি দেবার ব্যাপারে অতি তৎপর এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়"। (সুরা আনআম-১৬৫)। প্রতিনিধির কাজ বুঝানোর জন্য সহজ একটি উদাহরণ টানি- "পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে অন্যান্য দেশের দূতাবাস থাকে যেখানে সেই দেশের রাষ্ট্রদূত বা প্রতিনিধি থাকেন, যিনি স্ব-স্ব সরকারের নীতি-নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবেন এবং দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। যিনি যে দেশের রাষ্ট্রদূত, তিনি সেই দেশের সরকার প্রধানের নীতিমালার ভেতরে থেকেই সরকার কতৃক দেয়া কার্যক্রম সম্পাদন করবেন মাত্র এখানে তাঁর অর্থাৎ রাষ্ট্রদূত বা প্রতিনিধির ইচ্ছামাফিক কোন কার্যক্রম করতে তিনি পারেন না বা অনুমোদিত নয়"। আল্লাহ হলেন তাঁর অসীম এই সৃষ্টিজগতের শাসনকর্তা। তিনি তাঁর নিজের তৈরি কৃঙ্খলা, নিয়ম-নীতি মোতাবেক এই মহাসৃষ্টিকে শাসন করছেন। তিনি চাইলেন পৃথিবীতে নিজে সরাসরি শাসন করবেন না, এজন্য মানুষকে তাঁর পক্ষ থেকে খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। অর্থাৎ, মানুষের কাজ হলো সে আল্লাহর হয়ে পৃথিবী-তে শাসন করবে। কেমন করে করবে? আল্লাহ যেমন নিজের তৈরি আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি মোতাবেক মহাবিশ্ব শাসন করছেন, তেমনি পৃথিবী শাসনের জন্য তিনি আমাদের জন্য দিয়েছেন নির্দেশিকা বা সংবিধান, যা হলো মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় পবিত্র আল-কোরান এবং সাথে সেই সংবিধান মোতাবেক কীভাবে পৃথিবীতে শাসনকার্য চালানো যায়, সংবিধানের সকল ধারা-উপধ-ারার বাস্তবিক প্রয়োগ কীরকম হবে, এই সংবিধান যে পৃথিবীর জন্য একমাত্র সফল সংবিধান এবং এর আলোকে শাসন করলে এই পৃথিবী যে শান্তির নীড়ে পরিণত হয় তার বাস্তব উদাহরণের জন্য তিনি দিয়েছেন মানবতার মুক্তির দিশারী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও আল-কোরানের প্র্যাকটিক্যাল মডেল আল্লাহর প্রিয় রাসুল হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা আহমদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। যিনি সমগ্র জগতের রহমতস্বরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং সত্যিকার অর্থেই তাঁর ছোঁয়ায় এই মৃতপ্রায় পৃথিবী ফিরে পেয়েছিল সঞ্জীবনী শক্তি। নিকষ কালো অন্ধকারে সমগ্র পৃথিবী যখন হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন ঐশ্বরিক সংবিধানের আলোকে তিনি আলোক-ময় এক পৃথিবী উপহার দিয়ে যে নজির সৃষ্টি করেছেন তা পৃথিবীর শুরু থেকে প্রলয়কাল পর্যন্ত বেনজীর হয়ে থাকবে।

এখন আমরা যারা মুসলমান হিসেবে নিজেকে দাবী করি বা পরিচয় দিই আমাদেরও ঐশ্বরিক, থিওরি আর নবুওয়্যাতী প্র্যাকটিক্যালের বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এর বাইরে যাওয়া মানেই প্রতিনিধি হিসেবে আপনি অযোগ্য এবং আল্লাহ প্রদত্ত শাহী ফরমান না মানার অপরাধে অপরাধী! আর যারা সফল প্রতিনিধি, তারা নাজাত প্রাপ্ত ও জান্নাতী। এখন কথা হচ্ছে, প্রতিনিধি হিসেবে জমিনে আল্লাহ'র দ্বীন বা বিধান প্রতিষ্ঠা করা কি খুবই সহজ? না, এটি তত সহজ কাজ নয়, বরং অত্যন্ত কঠিন এই পরীক্ষাক্ষেত্র। কারণ পৃথিবীতে সকল মানুষ আল্লাহর তাওহীদ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে স্বীকার করে না বা মেনে নেয় না। আর তাই মুমিন মুসলমানগণ যখন আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দেয়া ও তদীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত বিধান বাস্তবায়নের সংগ্রামে শামিল হয়, তখন অন্য উপাস্যের পূজারী বা অন্য মতাদর্শের ধারক-বাহকরা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামরত মুমিনদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

অত্যাচারের মাত্রা যত তীব্র হয় আল্লাহর সৈনিকদের পথচলা তত দৃঢ় ও গতিশীল হয়। পাহাড়সম বিপদকে বীর মুজাহিদরা ফু দিয়ে উড়িয়ে দেয়, পৃথিবীর সব চাইতে ভয়ঙ্কর বোমা-বারুদকে তারা তুচ্ছ মনে করে এগিয়ে যায় সম্মুখপানে। কোন বাধা-বিপত্তি, জুলুম-নির্যাতন তোয়াক্কা না করে যখন তীব্র বেগে দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে, ঈমানের দাবি আদায়ে এগিয়ে চলে ইসলামের কালজয়ী আদর্শের পথ ধরে তখন আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে সাহায্য চলে আসে মু'মিনের পক্ষ হয়ে। "ওয়া কানা হাক্কান আলাইনা নাছরুল মু'মিনিন'-(সুরা রূম-৪৭) অর্থাৎ তখন মুমিনদের সাহায্য করা তাঁর (আল্লাহর) দায়িত্ব হয়ে যায়। কিন্তু শর্ত হলো, মুমিন হতে হবে এবং তাঁর সাহায্য পাবার উপযোগী হতে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সুরা আল ইমরানে ঘোষণা দিচ্ছেন- 'ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহযানু ওয়া আনতুমুল আ'লাওনা ইন কুনতুম মু'মিনিন' - "তোমরা নিরাশ হয়ো না (মনমরা, হীনবল হয়ো না), দুঃখ করো না। (মুষড়ে পড়ো না) তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও"। মুমিনদের জন্য এই জমিন বড়ই কঠিন! হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়া মুমিনদের জন্য কারাগার এবং কাফেরদের জন্য জান্নাত (স্বরূপ)"- মুসলিম"।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং সর্বকালের সর্বোত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বার-বার নেমে আসবে নির্যাতনের স্টিমরোলার। আমরা দেখেছি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা থেকে এ পথের পথিকের রক্তক্ষরণ! এ পথের বাঁকে-বাঁকে লুকিয়ে আছে বদর, ওহুদ, খন্দক, খায়বর আর হুনাইন। এই পথ ধরেই রচিত হয়েছিল কারবালার করুণ ইতিহাস। দ্বীনের পথ বড়ই পিচ্ছিল ও কন্টকাকীর্ণ; তবুও মুমিনদের অন্তর সবসময় শাহাদাতের সুরা পানে ব্যাকুল থাকে। শহীদি তামান্নায় পথ চলা-ই হলো প্রকৃত মুমিনের পরিচয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির সবচাইতে সহজ পথ হলো শহীদি পথ। শাহাদাতের সিড়ি বেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার এক অদম্য স্পৃহা যুগে-যুগে মুসলিম তরুণদেরকে ইসলামী আন্দোলনের পথে সাহস যুগিয়েছে। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা থেকে আজ অবদি শহীদী তালিকায় অপেক্ষাকৃত তরুণরাই বেশি। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে- হযরত সুমাইয়া (রাঃ),

হযরত সালমী (রাঃ), হযরত খুবাইব (রাঃ), হযরত মুসামা (রা), হযরত হামজা (রাঃ), হযরত হানজালা (রাঃ), প্রমুখ সাহাবীগণ তরুণ বয়সেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। হযরত সুমাইয়া (রাঃ) সেই তারুণ্যের নাম, যিনি নারীদের মধ্যে ইসলামের জন্য প্রথম প্রাণ দিলেন। হযরত সাদে সালমী (রাঃ) সেই যুবকের নাম, যাঁর বিয়ের সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত হয়েছে, বাজার থেকে বিয়ের সামগ্রী নিয়ে কনের বাড়ির দিকে ফিরছেন, এমন সময় তার কানে এল, "কে আছ, ইসলামকে বিজয়ী কর; কে আছ, জান্নাতের দিকে ছুটে চল" বলে কে যেন চিৎকার করছে। এই কথাগুলো শোনার পর তরুণ সাহাবী থমকে দাঁড়ালেন। বিবাহ, সুন্দরী স্ত্রীর মধুময় প্রেম, বাসর শয্যা, অনাগত ভবিষ্যতের শত স্বপ্ন- সব তাঁর মন থেকে মুছে গেল নিমিষেই। ফিরে গিয়ে দোকানীকে বললেন, এগুলো ফেরত নিয়ে আমাকে একটি ভাল তরবারী দাও। তারপর তিনি ছুটে চললেন যুদ্ধের ময়দানে এবং বীরের মত যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। যুদ্ধ শেষে তাঁর লাশ ঘিরে সাহাবীগণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু নবী মুহাম্মদ ﷺ মিটমিট করে হাসছেন। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ, আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন, "সাদে সালমীকে স্বাগত জানানোর জন্য জান্নাত থেকে হুরেরা ফুল নিয়ে এসেছেন"।

হযরত আবু মুসামা (রাঃ) সেই তরুণের নাম, শাহাদাতের প্রাক্কালে যিনি বলছিলেন, "জগৎ দেখুক; আবু জাহেলের পুত্র মুসামা যে ঈমান গ্রহণ করেছে, সেই কারণেই পিতার সাথে যুদ্ধ করে জীবন দিতে দ্বিধা করে নাই"। হযরত হামজা (রাঃ) সেই শহীদের নাম, যাঁর দেহ শত্রুরা টুকরো-টুকরো করে কেটে বিকলাঙ্গ করেছিল। যা দেখে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। হযরত হানজালা (রাঃ) সেই খোদা প্রেমিকের নাম, নববধুর সাথে বাসর শয্যা যাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। শাহাদাতের অদম্য বাসনায় কোরান-হাদিসের রাজ কায়েমের জন্য যিনি যুদ্ধের ময়দানে ছুটে গিয়েছিলেন এবং স্ত্রীর আলিঙ্গন উপেক্ষা করে বাতিলের রক্ত লোলুপ তরবারীর আলিঙ্গন গ্রহণ করেছেন।

মুমিন মুসলমানরা কোনকালে আপন জান-মালের ভয় করেননি। তাঁরা তো তাঁদের জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। সুরা তাওবার ১১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- "নিশ্চয়ই আল্লাহ বেহেশতের বিনিময়ে মুমিনদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শত্রুদেরকে হত্যা করে এবং নিজেও শহীদ হয়। এটাই তাওরাত ও ইঞ্জিলে এবং পবিত্র কুরআনে আল্লাহর দেয়া ওয়াদা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং অঙ্গীকার পালনে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক বিশ্বস্ত! তাই আল্লাহর সাথে তোমাদের যে কেনা-বেচা হয়েছে, সেজন্য আনন্দিত হও এবং এটাই বড় সাফল্য"।

আর তাই মু'মিন হতে হলে আপনাকে থাকতে হবে দ্বীনের পথে অবিচল, শপথ হতে হবে সীসাঢ-ালা মজবুত আর দৃঢ়। সকল ভয় আর বাধা-বিপত্তির হিমালয় ডিঙিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথে একটি সুন্দর ও আদর্শিক সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেকে পরিপূর্ণ সঁপে দিয়ে বিরামহীন সংগ্রামে জীবনকে অতিবাহিত করতে হবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সংগঠক
সৌদি আরব।

ফারুকী আন্দোলনঃ ছাত্রসেনার ভূমিকা

মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন রব্বানী

বাংলাদেশসহ পাক-ভারত উপমহাদেশে সুন্নীয়তের আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী একটি নাম বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা। এ সংগঠনটির মাত্র ৩৬ বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এটা প্রমাণিত হবে হাজার বছরের সুন্নীয়তের আন্দোলনে ছাত্রসেনার আন্দোলনই অন্যতম। এ মুহূর্তে ছাত্রসেনার আন্দোলন ছাড়া অন্যকোনভাবে সুন্নীয়তকে প্রতিষ্ঠার বিকল্প নাই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ সংগঠনের জোরালো যে ক'টি আন্দোলন সুন্নীয়তকে বাংলার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তার মধ্যে অন্যতম একটি ফারুকী আন্দোলন। বলছি শায়খ আল্লামা নুরুল ইসলাম ফারুকী (রহ:)কে শাহাদাতের পরবর্তীতে তাঁর নৃশংস হত্যার বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলনের কথা। যে আন্দোলন না হলে হয়তো সুন্নীয়ত যে বাংলাদেশে আছে সেটাই মানুষ বিশ্বাস করতো না। সরকারসহ প্রশাসন জানতো না সুন্নীয়তের শক্তির কথা। এই এক আন্দোলনই দেশ-বিদেশে সুন্নীয়তের শক্তিমত্তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

২০১৪ সালের ২৭ আগষ্ট। এ দিন সন্ধ্যায় রাজধানী ঢাকার রাজাবাজারে নিজ বাসায় খুন হন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশে সুন্নীয়তের প্রচার-প্রসারে মিডিয়া আলোচক, বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, ইসলামী চিন্তাবিদ, শায়খ আল্লামা নুরুল ইসলাম ফারুকী। তাঁকে সুন্নীবিরোধী জঙ্গিগোষ্ঠি অত্যন্ত নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করে। এ খবর যখন মিডিয়ার কল্যাণে সারাদেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে তখন ঘৃণ্য এই হত্যার বিচার ও হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবীতে প্রথম আন্দোলনের ডাক দেয় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা। অবশ্য আমাদের কর্মসূচি প্রদানের আগেই সেনার বীর মুজাহিদরা রাস্তায় নেমে পড়ে সাথে-সাথে। কারণ, আমরা তখনো অপেক্ষা করছিলাম আমাদের মুরব্বীদের কর্মসূচির দিকে। আমি আমার সভাপতি নুরুল হক চিশতি ভাইয়ের সাথে আলাপ করে উনাকে ঢাকায় আসার জন্য অনুরোধ করলাম। চট্টগ্রামে যেহেতু সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ বিক্ষোভ হবে তাই আমি চট্টগ্রামের আন্দোলনকে দেখাশুনার জন্য চট্টগ্রামেই থেকে গেলাম। ঐরাতে আমি সভাপতি মহোদয়সহ আমাদের নেতৃবৃন্দের সাথে ফোনালাপ করে প্রথমে পরের দিন সকাল ৮ টার মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম-কক্সবাজারসহ দেশের সকল মহাসড়কসমূহে বেরিকেট সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এরপরে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ সকল জেলাশহরে বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিলাম। রাত কাটলো ফোনে-ফোনেই।

সকালে ওঠে রেডি হয়ে রাস্তায় নামতে দেখি গাড়িঘোড়া কিছুই নেই। তার মানে বেরিকেট সময়ের অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে তৎকালীন অর্থ সম্পাদক শাহাদাত হোসাইনকে নিয়ে চট্টগ্রামের মুরাদপুরে যেখানে আমাদের জমায়েত হওয়ার কথা সে স্পটে গেলাম। স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার, ঘটনার রাত এ মুরাদপুরেই সবচেয়ে বেশি বিক্ষোভ দেখিয়েছিল আমাদের নেতাকর্মীরা। যা প্রত্যেকটি মিডিয়া প্রচার করেছিল। আমরা সেখান থেকে বিশাল এক মিছিল নিয়ে রওয়ানা হলাম চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের দিকে। সেখানে ইসলামী ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। মিছিলের অবস্থা আর সাধারণ মানুষের অবস্থা দেখে সে

মিছিলের স্রোত বেড়ে তা নিউ মার্কেট হয়ে ঘুরে আসে প্রেসক্লাবের সামনে। সেখানে গণমাধ্যম কর্মীরা আমাদের কর্মসূচি চাইলে আমি সভাপতি মহোদয়সহ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে খুনিদের গ্রেপ্তারের ২দিনের আল্টিমেটাম দিয়ে ৩১ আগষ্ট পূর্ণ দিবস হরতালের ঘোষণা দিই। একইসাথে ঢাকায় সভাপতি মহোদয়ও হরতালের ডাক দেন; যাতে আন্দোলন এক ভিন্ন মাত্রা পায়।

বলতে কী, মিডিয়া কর্মী ও প্রশাসনের দৌড়-ঝাঁপ বেড়ে যায়। আর আমাদের কর্মীসহ সাধারণ সুন্নীদের মধ্যে আন্দোলনের এক তীব্রতা সৃষ্টি হয়। সবার মধ্যে মর্দে মুজাহিদ ভাব দেখা যায়। কিন্তু, প্রেসক্লাবে চলা আমাদের মুরব্বী নেতৃবৃন্দের কর্মসূচি হরতালমুক্ত হওয়ায় কর্মীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, এমনকি মিডিয়া কর্মীরাও হরতাল হওয়া নিয়ে ধোয়াশার মধ্যে আমাদের বারবার প্রশ্নের সম্মুখীন করেন। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ কৌশলগত দিক দিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সমন্বয় কমিটি ব্যানারে আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। আর আহলে সুন্নাত ইতিমধ্যে ১২ দফা ঘোষণার মাধ্যমে হরতালের বিরূদ্ধে অবস্থান নেয়ায় মূলত এ কঠোর কর্মসূচি থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু আমরা হরতালের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করি। আমাদের দাবি একটাই, হয়তো ফারুকীর খুনীদের গ্রেপ্তার কর, নয়তো হরতাল পালন করবোই। এ ঘোষণায় অটল থেকে আমরা আহলে সুন্নাতের বিক্ষোভ মিছিলেও যোগ দেয়। এ মিছিল চলাকালে প্রশাসনের বিভিন্ন এজেন্সি ও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মিডিয়া হরতাল কর্মসূচি নিয়ে আমার বক্তব্য নিতে শুরু করে। বিবিসির শায়লা রোকসানা প্রায় ১৮ মিনিট ধরে ফারুকী ইস্যুতে হরতাল নিয়ে দলের সামর্থসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রেকর্ড করে। যার কিছু অংশ ঐদিন রাতে প্রচার করে। এ সময় মনে হলো হরতালটি আন্দোলনের টনিক হিসেবে কাজ করেছে। না হয় মিডিয়া ও প্রশাসনের বিভিন্ন লোকজন এভাবে আমাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তো না। চ্যানেল ৭১ এর চট্টগ্রাম অফিস থেকে ফোন করে চ্যানেলটি রাত ১২ টার টক শো'তে কথা বলার জন্য আমাকে অনুরোধ করে। আমি আমার সভাপতি এবং মতিন সাহেবের সাথে কথা বলে ঐ লাইভ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। মনে হয় কোন চ্যানেলে লাইভ টক শো'তে ছাত্রসেনার কোন প্রতিনিধির কথা বলার এটাই প্রথম ঘটনা। আপনারা হয়তো দেখেছেন যেখানে রাজনীতি বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) আবদুর রশিদ, সাংবাদিক নেতা মনজুরুল আহছান বুলবুলের মতো ব্যক্তিদের সাথে ছাত্রসেনার আন্দোলন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। চট্টগ্রামের মতো ঢাকায়ও মিডিয়া কর্মীরা আমাদের আন্দোলনের বিষয়ে সভাপতি মহোদয়ের সাথে কথা বলেন। তিনিও হরতালের যৌক্তিকতা ও সামর্থের কথা জোর দিয়ে বজ্রকণ্ঠে বলেছেন। ফলে ঢাকা চট্টগ্রামসহ সারাদেশে ফারুকীর বিচারের দাবিতে এক উত্তাল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

পরের দিন জুমাবার। আমরা মসজিদে-মসজিদে দোয়া মাহফিল ও নামায শেষে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভার ডাক দিই। মিডিয়া কর্মীরা ছুটে যায় মসজিদে মসজিদে নিউজ কাভার করতে। পুলিশও সতর্ক অবস্থায় থাকে সাথেসাথে। সেদিনও আমরা হরতাল বিষয়ে ছিলাম অনঢ়। ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে এক মহিলাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মূলত তা ছিল আমাদের আন্দোলনকে ভণ্ডুল করার জন্য। কিন্তু আমরা তাতে দমে যাইনি। দেশ-বিদেশ থেকে আমাদের নেতাকর্মী সমর্থকরা যেকোন মূল্যে হরতালসহ আন্দোলন সফল করার প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে। এরমধ্যে ঘরে-বাইরে থেকে হরতাল প্রত্যাহারের চাপও আসতে থাকে। নেতৃবৃন্দের যুক্তিও

অমূলক ছিল না, কিন্তু আমাদেরও হরতাল প্রত্যাহারের সুযোগ ছিল না। কেননা কর্মীদের প্রত্যাশার বাইরে যাওয়ার সাহস আমাদের ছিল না। হরতাল হবে, এটা ধরে নিয়ে আমি সভাপতিসহ নেতৃবৃন্দের সাথে হরতাল ও আন্দোলন বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সাথে উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মতিন সাহেবের পরামর্শও নিচ্ছিলাম। এরই মাঝে পটিয়ার ফ্রন্ট নেতা আলহাজ্ব আলী হোসাইন ভাই আমাকে ডেকে নিয়ে ছোট্ট একটি পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা হরতাল প্রত্যাহার নয় বরং পূর্ণ দিবসের বদলে অর্ধ দিবসের সিদ্ধান্ত নাও। তিনি এর সফলতা বিফলতার বেশ ক'টি বিষয়ও তুলে ধরেছিলেন। যা আমার কাছে খুবই যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। এটা মাথায় রেখে ২৯ আগষ্ট শনিবার আমি চট্টগ্রামের দলীয় অফিসে চট্টগ্রামে অবস্থানরত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সভা আহবান করি। আর ঢাকায় সভাপতির নেতৃত্বে ঢাকায় অবস্থানরত নেতৃবৃন্দরা বৈঠকে মিলিত হয় একই সময়। সত্যি কথা বলতে কী, আন্দোলনের দৌড়-ঝাঁপ এত বেশি তীব্র ছিল, আমরা যারা চট্টগ্রামে ছিলাম তাদের তখন ঢাকায় যাওয়ার চিন্তাও করতে পারছিলাম না। কারণ আন্দোলনের মাত্রা অন্য যেকোন স্থান থেকে চট্টগ্রামে কয়েকগুণ বেশি ছিল।

শনিবার ঢাকা ও চট্টগ্রামে আমরা একইসাথে যোগাযোগ করে হরতাল সফল করতে বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। হরতাল বিষয়ে একটা নেগেটিভ ধারণা প্রশাসন-মিডিয়াসহ সাধারণ জনগণের আছে যে হরতাল মানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। যেটা নিয়ে আমাকে ৭১ টিভিসহ প্রায় প্রত্যেকটি মিডিয়া থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। আমরা বারবার বলতে চেষ্টা করেছি যে আমরা কোন ভাঙাভাঙ্গি বা অগ্নিসংযোগের কর্মসূচি দিইনি, দেবও না। তাই ঐ বৈঠকে আমি প্রস্তাব রাখলাম ভাঙাভাঙ্গি থেকে কর্মীদেরকে বিরত রাখার জন্য আমরা হরতাল পালনকালে মিছিল ও বক্তৃতা দেয়ার পাশাপাশি রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিলাদ-কিয়াম ও দরুদ শরীফ আদায় করব। এটা হলে হরতালও শান্তিপূর্ণ হবে আর প্রশাসন-মিডিয়াসহ সাধারণ জনগণও আমাদের হরতালকে ব্যতিক্রমী হরতাল হিসেবে মনে রাখবে। যা হবে অন্যান্য দলের জন্য মডেল আন্দোলন। আমার এ প্রস্তাব সবাই গ্রহণ করলে ঢাকায়ও তা জানিয়ে দেয়া হয়। এ ছাড়া দাবি আদায় না হলে ৩০শে আগষ্ট ঢাকায় বিকাল ৩টায় এবং চট্টগ্রামে বিকাল ৪টায় হরতাল করার ঘোষণা দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত হয়।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য তৈরী করার জন্য চট্টগ্রাম মহানগরের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক নুরুল্লাহ রায়হান খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ঐ বৈঠকসহ চট্টগ্রামে আমার সাথে সার্বক্ষণিকভাবে ছিলেন কেন্দ্রিয় সহ-সভাপতি ইব্রাহীম খলিল, তখনকার সাংগঠনিক সম্পাকদ সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, অর্থ সম্পাদক আজিম উদ্দীন আহমদ, প্রকাশনা সম্পাদক শাহাদাত হোসাইনসহ চট্টগ্রাম উত্তর, দক্ষিণ, মহানগর ও চবি শাখার সিনিয়র নেতৃবৃন্দ।

সেকেন্ড ফুরিয়ে মিনিট, মিনিট ফুরিয়ে যায় ঘন্টা, ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করি। কখন খুনি গ্রেপ্তার হবে। হরতালের মতো কঠিন এক কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের মানুষকে সামান্য সময়ের কষ্ট থেকেও আমরা মুক্ত রাখতে পারবো, কিন্তু না। প্রশাসনের কোন উদ্যোগই পরিলিক্ষিত হয়নি যে তারা খুনিদের গ্রেপ্তার করবে।

শেষমেশ আমরা ৩০শে আগষ্ট ঢাকা ও চট্টগ্রামে নির্ধারিত সময়ে সংবাদ সম্মেলন করে হরতাল পালন করার ঘোষণায় বহাল রাখলাম। সেদিন চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মীদের অবস্থা দেখে আমি বিস্মিত হয়। প্রায় ১৮টি টিভি ক্যামেরা সংবাদ সম্মেলনকে ঘিরে রেখেছিল। প্রিন্ট মিডিয়ার ফটো সাংবাদিকসহ অন্যান্য সাংবাদিকরা তো ছিলই। ঢাকায়ও তদ্রুপ সাংবাদিকরা হুড়োহুড়ি করে আমাদের নিউজ কাভার করেছিল। এমনকি সংবাদ সম্মেলন শেষ প্রায় সাথে সাথে সাংবাদিক ভাইয়েরা ফোন করে জানাচ্ছিলেন যে কার নিউজটি আগে প্রচার করা হচ্ছে। যে সাংবাদিকদের হাজার-হাজার টাকা দিয়েও নিউজ কাভার করাতে পারিনি তারাই আজ নিউজ প্রচারের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের পক্ষ থেকেও সাংবাদিক সম্মেলন করে আমাদের হরতালকে সমর্থন দেয়া হয়।

অতপরঃ সেই ক্ষণ। শঙ্কা আর উদ্বেগের মাঝেও সাহসটা ধরে রাখতে পেরেছিলাম অসংখ্য অগণিত কর্মী ভাইদের প্রাণপণ তেজস্বী ও নিরলস কর্মতৎপরতা দেখে। ৩১ আগষ্টের ভোর ৬টা যেন অনেক দেরী একটা সময়। প্রায় নেতাকর্মী ভাইয়েরা রাস্তায় নেমে পড়েছিল ৬টার অনেক আগেই। রাতে ঢাকা ছেড়ে আসা নাইট কোচগুলো আটকে দিয়েছে রাস্তায়-রাস্তায়। পুলিশের জোর তৎপরতাও তাদের দূরে সরাতে পারেনি। এ অবস্থা দেখে ৬টার পর যাদের রাস্তায় গাড়ি নামানোর দু:সাহস ছিল তারাও চুপসে যায়। শুধু ইঞ্জিন চালিত যানবাহন? সাইকেল-রিক্সা-ভ্যান, এমনকি দোকান-পাটও বন্ধ হয়ে যায়। চট্টগ্রাম যেন এক নিস্তব্ধ শহর। এভাবে খবর আসছিল ঢাকায় সভাপতির নেতৃত্বে কড়াকড়িভাবে হরতাল পালিত হচ্ছে। আমাদের কর্মীরা ঢাকার বুকে বুক উঁচিয়ে গগণ বিদারী চিৎকারে স্লোগান তুলছে। ফারুকীর খুনিদের গ্রেপ্তারের তীব্র দাবি সরকারের কুঁকুহরে পৌঁছাতে চেষ্টা করছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরসহ সারাদেশে নবী প্রেমিক বীর সেনানী ভাইদের রাজপথে অবস্থানে পুরো দেশ অচল হয়ে যায়। খুনি জঙ্গিদের আস্তানাসহ বাতিলদের কিল্লা যেন দ্রোহের আগুনের জ্বলতে থাকে। সরকার, প্রশাসন, মিডিয়া ও সাধারণ জনগণ অবাক হয়ে দেখে বীর মুজাহিদদের বীরত্বগাথা। ফারুকী বিচারের দাবি হয়ে ওঠে সকল জনগণের দাবি। সেদিন আমরা চট্টগ্রামের মুরাদপুর থেকে নিউমার্কেট মোড়, ফটিকছড়ি থেকে বাঁশখালি এবং টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত খবরাখবর রাখছিলাম।

খানিক বাদে বাদে ফোন আসে কুমিল্লায় আমাদের ছেলেদের সাথে হেফাজতের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে, পটিয়ায় ছাত্রলীগের গুন্ডারা আমাদের উপর হামলা করেছে, পাহাড়তলীতে আমাদের কর্মীদের উপর জামাত-শিবির চোরগুন্ডা হামলা চালিয়েছে, বহদ্দারহাট থেকে আমাদের ৩জন কর্মীকে পুলিশ এরেস্ট করেছে। ঢাকায় পুলিশ আমাদের মিছিল করতে দিচ্ছে না বা নারায়নগঞ্জে আমাদের উপর প্রতিপক্ষ হামলা করেছে। চাঁদপুরে রেল যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। এভাবে চলতে থাকে হরতালে প্রতিটি সময়। আমাদের দৌড়াদৌড়িও বাড়ে বেলা বাড়ার সাথেসাথে। আর আমাদের চেয়েও দৌড়াদৌড়ি বেশি বাড়ে মিডিয়া কর্মীদের। মাদ্রাসার এতিমখানার ৭ বছরের বাচ্চাটি থেকে শুরু করে জামেয়ার মুফাচ্ছির-মুহাদ্দিস-মুফতিরাও মাঠে নামে স্লোগান দেয়, মিছিল করে। তদ্রুপ ঢাকাসহ সারাদেশে। হরতালের সময় ফুরোতে-ফুরোতে আমরা ঢাকা-চট্টগ্রামের সেনা নেতৃবৃন্দ ফোনালাপে হরতাল পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করে নিই। যেহেতু

হরতাল শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের মুখোমুখি হতে হবে। বেলা ২টা বাজার সাথে সাথে ঢাকায় চিশতী ভাই আর আমি চট্টগ্রামে হরতাল শান্তিপূর্ণভাবে পালন করায় আমাদের নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই। পরবর্তী কর্মসূচি আমরা ২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম লালদীঘি মাঠে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সমাবেশে ঘোষণা করার কথা বলি।

হরতাল শেষে যমুনা টিভি থেকে চট্টগ্রাম স্টুডিওতে সন্ধা ৬টার খবরে সরাসরি বক্তব্য নেয়ার জন্য অনুরোধ করলে আমি, তখনকার সাংগঠনিক সম্পদক সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, অর্থ সম্পদাক আজিম উদ্দীন জনি ভাইসহ সেখানে তাদের অনুষ্ঠানে আমাদের সফল কর্মসূচির কথা তুলে ধরি এবং প্রশাসন, মিডিয়া, ড্রাইবার, শ্রমিক, ব্যাবসায়ীসহ জনগণের প্রতি ছাত্রসেনার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এই দিন প্রথম আলোর চট্টগ্রামের ব্যুরো চীফ ফোন করে আমাদের হরতালকে ঐতিহাসিক, নজীরবিহীন ও শান্তিপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করে। সেদিন ইলেকট্রনিক মিডিয়া, অনলাইন পত্রিকা এবং পরদিন প্রিন্ট মিডিয়া লীড নিউজসহ একাধিক রিপোর্টে আমাদের হরতালের চুলছেড়া বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। শুধু পত্রিকা বা টিভিতে নয় সাধারণ জনগণ এমনকি বিরোধী মতবাদীরা পর্যন্ত আমাদের শান্তিপূর্ণ নজীরবিহীন হরতালের ভূয়সী প্রশংসা করে আমাদের সমর্থন দেয়। যে আন্দোলনটি শুধু ফারুকীর বিচারের দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেনি, সুন্নীদের অবস্থানকেও বিশ্ববাসীর নিকট সগৌরবে উপস্থাপন করেছে। প্রায়ই সবার মূল্যায়ন ছিল যে, এ আন্দোলন ছাত্রসেনাকে নয় শুধু, সুন্নী জমাতকেও একশ বছর এগিয়ে দিয়েছে। অনেক আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ হয়তো আমাদেরকে স্বীকার করতে চান না বা সহযোগীতা করতে চান না। অথচ মাওলানা ফারুকী নয়, শফিউল নিজামী, প্রিন্সিপাল জালাল উদ্দীন আলকাদেরীসহ অসংখ্য নির্যাতিত আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদের বিপদে বীরত্বের সাথে রাজপথে নেমে লড়াই করেছে এ ছাত্রসেনা। আন্দোলনের ডাক দিয়ে বাতিলদের অন্তরে ভয়ের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে এ ছাত্রসেনা।

সরকার ও প্রশাসনের তোয়াজ না করে সুন্নীদের শক্ত অবস্থানকে সগৌরবে তুলে ধরেছে এ ছাত্রসেনা। সুতরাং, তিন যুগ পূর্তির সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সম্মানিত আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখসহ সাধারণ সুন্নী মুসলিম ছাত্র-জনতাকে আহবান জানাই, আসুন, সুন্নী হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে, সুন্নীয়তকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে, এদেশের মসনদে সুন্নীয়তের আদর্শ ভিত্তিক আইন প্রতিষ্ঠা করতে ছাত্রসেনার ভাইদের সাথে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শপথ করি। ইনশাআল্লাহ ! আমরাই এ বাংলায় সুন্নীয়তের পতাকা উড্ডীন করবো। গড়বো শান্তির সমাজ।

লেখক-

সাবেক সাধারণ সম্পাদক,বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা

রাসুলুল্লাহ (ﷺ)'র কয়েকটি মুজিজা

মুফতি মুহাম্মদ আনিসুর রহমান রিজভি

যুগে-যুগে মানুষকে তাওহিদের পথে হেদায়ত দানের জন্য আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে অসংখ্য নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। সেসব মহান নবী-রাসুলগণ মানুষের হেদায়তের পাশাপাশি তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিয়েছেন মুহূর্তেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লহু আ'নহুম আজমাইনও তাঁদের বিপদ-আপদ ও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি কিংবা ক্ষতস্থানের চিকিৎসার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাৎক্ষণিক তাঁদের সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকও। বর্তমান ডাক্তার-গণ আধুনিক বিজ্ঞান ও নানা প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপারেশনের মাধ্যমে কাঁটা-ছেঁড়ার যে চিকিৎসা করছে তা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশত বছর পূর্বে হাতের আঙ্গুল মোবারক দ্বারা করেছেন অত্যন্ত সুনিপূণভাবে। এটা ছিল মহান আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা। আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য নবীদেরকে সেসব মুজিজা দান করেছেন, সবগুলোই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছেন। নিম্নে আলোচ্য বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করার প্রয়াস পাচ্ছি।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, "তোমরা নেক ও খোদাভীতির কাজে একে-অপরকে সাহায্য করো এবং গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে-অপরকে সাহায্য করো না"। *(সুরা মায়েদা, আয়াত:২)*

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানদেরকে পরস্পর সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। একথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, একে-অপরকে সাহায্য তখনই সম্ভব যখন কোন দুর্বল মু'মিন অপর কোন সবল মু'মিনের কাছে সাহায্য চায়। প্রকাশ থাকে যে, এই সাহায্য চাওয়া মূল মুয়ামালাতেও খোদায়ী হুকুমের অধীন এবং রুহানি মুয়ামালাতেও। অনুরূপভাবে আসবাবের অধীন মুয়ামালাও এতে অন্তর্ভুক্ত। এভাবে কুরআনুল কারীমে অসংখ্য আয়াত বিদ্যমান যে, নবীগণ আলাইহিমুস সালাম আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন- হযরত মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এক কিবতী এক জালেমের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের চেয়ে তাওহীদে অধিক বিশ্বাসী আর কারা হতে পারে, যাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদের প্রচার করা? আল্লাহ তায়ালা ঐ কিবতী ও মুসা আলাইহিস সালাম দু'জনের কাউকেই মুশরিক সাব্যস্ত করেননি। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, "অতঃপর যে ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থনা করল, সে মুসা আলাইহিস সালামের কওমের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল সে মুসা আলাইহিস সালামের শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত ছিল"। *(সুরা কাসাস, আয়াত:১৫)*

হাদিসের দৃষ্টিতে আম্বিয়ায়ে কেরামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা:

বিপদের মুহূর্তে কারো সাহায্য প্রার্থনা করা বা সাহায্য গ্রহণ করা এবং বিপদ-আপদে একে-অপরকে সাহায্য করা একজন মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের হক বা অধিকারও বটে। ইসলামের মূলবাণীর উদ্দেশ্যই হলো মুসলমানদের শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান নিশ্চিত করা। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের পবিত্র হায়াতেও মানুষের প্রতি দয়া, সাহায্য ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়েছে। এমনকি আমাদের প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আলামীনকে তায়েফের ময়দানে পাথর নিক্ষেপের সময়ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য অভিশাপের পরিবর্তে হেদায়াতের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করেছেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেছেন, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের এহেন জঘন্য অপরাধের কারণে তাদের উপর গজব নাযিল না করেন। উম্মতের দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত করা এবং মানুষের কল্যাণ সাধন করাই ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ। এমনকি কেয়ামতের ময়দানেও যখন মানুষের উপর সবচেয়ে বড় বিপদ আপতিত হবে, সকলেই নফসি-নফসি করতে থাকবে। তখন লোকেরা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও আউলিয়ায়ে কেরাম ও নেককার লোকদের কাছে এই মহাবিপদ হতে রক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবে। যদিও সকলে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানাবেন, কিন্তু প্রিয় নবি রাহমাতুল্লিল আলামীন উম্মতদের খুঁজতে থাকবেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। নবীজির সুপারিশের মাধ্যমে উম্মত এই মহাবিপদ হতে মুক্তি পাবেন। যেমন- নবীজি হাদিসে পাকে এরশাদ করেন, "লোকেরা আদম আলাইহিস সালামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন, তারপর মুসা আলাইহিস সালামের কাছে, এবং পরিশেষে নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে"।
(বুখারী: আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত: ১/১৯৯)

এছাড়াও আরো অনেক হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। নিজেদের দারিদ্র, রোগ, হাজত, বিপদ, ঋণ ও অক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সাহায্য চাইতেন এবং সাথে-সাথে সমস্যার সমাধান পেয়ে যেতেন। তাঁদের আক্বিদা বা বিশ্বাস ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই দোয়া কবুল হওয়ার প্রধান ও একমাত্র মাধ্যম।

সাহাবায়ে কেরামের আমলের আলোকে নবি রাহমাতুল্লিল আলামীনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা:

সাহাবায়ে কেরামগণ নবীজির কাছে সাহায্য চাইতেন এবং সাথে-সাথে এসব সমস্যার সমাধান পেয়ে যেতেন।
নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণিত হলো:

এক. সৈয়্যদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুঃ
সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্মরণশক্তি প্রাথমিক অবস্থায় খুবই কম ছিল। তিনি কোনোভাবেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস মুখস্থ রাখতে পারছিলেন না। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাঁর এই সমস্যাকে চিরদিনের জন্য দূর করে দিলেন। সৈয়্যদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর এই ঘটনাটি তিনি নিজেই বর্ণনা করেন। যেমন- হাদিসে পাকে এরশাদ হয়েছে, "আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার কাছ থেকে অনেক হাদিস শুনি কিন্তু ভুলে যাই"। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তোমার চাদরখানা বিছাও"। "তখন আমি চাদরখানা বিছালাম"। সৈয়্যদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, "অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মোবারক দ্বারা অদৃশ্য কিছু সেই চাদরে রাখলেন ও বললেন, "চাদরটি তোমার গায়ে জড়িয়ে নাও"। আমি চাদরটি আমার গায়ে জড়িয়ে নিলাম। এরপর থেকে আমি জীবনে আর কোন দিন হাদিস ভুলিনি"।"
(বুখারীঃ আস-সহীহ, কিতাবুল ইলমঃ ১/১৯৯, হাদিসঃ ১১৬, কিতাবুস সাওমঃ ১/২৭৪, হাদিসঃ ৩৩৭৫)

উপর্যুক্ত হাদিসে পাক থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, সাহাবায়ে কেরামগণও তাঁদের সকল সমস্যার জন্য রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতেন। সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে বড় একত্ববাদী আর কারা হতে পারে? এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বড় তাওহীদ প্রচারকারী আর কে হতে পারে? অথচ এতদসত্ত্বেও সৈয়্যদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অস্বীকৃতি না জানিয়ে তাঁর সমস্যাটিকে সারাজীবনের জন্য সমাধান করে দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে সকল একত্ববাদীগণ এটা জানতেন যে, প্রকৃত সাহায্য শুধু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, যা আম্বিয়ায়ে কেরামের ও উম্মতের নেককার বান্দাদের ওসিলা। আর ওসিলা হলো দোয়া কবুল হওয়ার সবব এবং যাঁদের ওসিলা নিয়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় এবং সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সৈয়্যদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেননি যে, "যাও, আল্লাহর কাছে দোয়া করো এবং হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো"; বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈয়্যদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।

দুই. সৈয়্যদুনা কাতাদাহ ইবনে নূমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাহায্য প্রার্থনাঃ
সৈয়্যদুনা কাতাদাহ ইবনে নূমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চোখ মোবারক গযওয়ায়ে বদরের সময় অন্ধ হয়ে গেল এবং চোখের পুতলি সস্থান হতে বের হয়ে বাইরে লটকে গেল। কষ্টের আধিক্যের কথা বিবেচনা করে সাহাবীদের পরামর্শে মুহসিনে কায়েনাতের দরবারে গিয়ে ঘটনার বর্ণনা ও আরোগ্য কামনায় সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যেমন- হাদিসে পাকে এরশাদ হয়েছে, "সৈয়্যদুনা কাতাদাহ ইবনে নূমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, "নিশ্চয়ই আমার চোখ

বদর যুদ্ধের সময় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং চোখের পুতলি বের হয় মুখমন্ডলে চলে এসেছিল। সাহাবীগণ সেটা কেটে দিতে চেয়েছিলেন। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি তা করতে নিষেধ করলেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন এবং চোখকে সস্থানে প্রতিস্থাপন করলেন। এতে সৈয়্যদুনা হযরত কাতাদাহ ইবনে নূমান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চোখ এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেল তিনি বুঝতেই পারলেন না যে, ইতিপূর্বে তার চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল"।"
(বাইহাকী, দালায়িলুন নবুওয়াত: হাদিস: ১০০৩, ইবনে কাসীর, আত-তারিখ: ৩/২৯১)

তিন. ফোঁড়া আক্রান্ত সাহাবীর সাহায্য প্রার্থনা:
হাদিসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন ফোঁড়া আক্রান্ত সাহাবীর সাহায্য প্রার্থনা কথা বর্ণিত হয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর হাতে ফোঁড়া (ঝঃৎঁসধ) ছিল। যার কারণে জিহাদের ময়দানে ঘোড়ার লাগাম কিংবা তরবারির হাতল ধরা তাঁর জন্য খুব কষ্টকর ছিল। সেই সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলেন এবং সেই রোগের আরোগ্য লাভের প্রার্থনা করলেন। যেমন- হাদিসে পাকে এরশাদ হয়েছে, "আমি রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। আমার হাতে একটি ফোঁড়া ছিল। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার হাতে একটি ফোঁড়া রয়েছে। যার কারণে ঘোড়ার লাগাম ও তরবাবির হাতল ধরতে আমার খুব কষ্ট হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "আমার কাছে এসো"। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ফোঁড়াকে খুললেন এবং আপন হাতে ফুঁ দিলেন, এবং স্বীয় হাত মোবারক আমার ফোঁড়ার উপর রেখে চাপ দিতে লাগলেন। অবশেষে যখন হাত তুললেন, তখন ফোড়াটি সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে গেল।"
(তাবরানী: আল-মুজামুল কবির, ৬/৪৬৮, হাদিস: ৭০৬৫, হাইসমী: মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৮/২৯৮)

চার. অন্ধ সাহাবীর সাহায্য প্রার্থনা:
মাতৃগর্ভের অন্ধদেরকে দৃষ্টিশক্তির নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা সৈয়্যদুনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিজা ছিল। অন্যান্য নবীদের সকল মুজিজা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। সে হিসেবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেও সেই মুজিজা ছিল। যেমন- হাদিসে পাকে এরশাদ হয়েছে, "এক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরজ করলেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে তোমার রহমতের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় মনোনিবেশ করছি। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার ওসিলায় আপনার রবের প্রতি নত হচ্ছি যেন আমার এই হাজত পূর্ণ হয়। হে আমার প্রতিপালক! আমার ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ ও শাফায়াতকে কবুল করে নিন।"
(তিরমিযী, আস-সুনান, আবওয়াবুদ দাওয়াত, ২/১৯৭, হাদিস: ৩৫০২, আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ: ৪/১৩৮, হাকেম, আল-মুসতাদরাক: ১/৩১৩)

লক্ষ করলে দেখবেন যে, উপর্যুক্ত হাদিসে পাকে বর্ণিত দোয়ার প্রারম্ভিক বাক্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা পেশ করা হচ্ছে। আবার একই দোয়ার দ্বিতীয় বাক্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হচ্ছে। এতে আল্লাহর দরবারে মকবুল বান্দাদের কাছ থেকে শুধু সাহায্য প্রার্থনা বৈধ নয় বরং নির্দেশ করা হচ্ছে যে, যদিও আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা বৈধ ও বিশুদ্ধ না হতো, তাহলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজ করার নির্দেশ ও এরশাদ করতেন না।

পাঁচ. এক সাহাবীর বৃষ্টির জন্য সাহায্য প্রার্থনা:
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের ঈমান-আক্বিদা ছিল, তাঁদের যেকোন সমস্যার সমাধান নবীজির কাছে পাবেন। তাই তো তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য সব ধরনের সমস্যার সমাধান নবীজির কাছ থেকে করে নিতেন। ঠিক তেমনি একবার একটি জাতীয় সমস্যা দেখা দেয়। একদা খরার কারণে ফসল উৎপাদন ও পানির কূপসমূহে পানির খুব অভাব দেখা দিলে সাহাবায়ে কেরাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে গেলেন। যেমন: হাদিসে এসেছে, "সৈয়্যদুনা হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন আমাদের মাঝে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অনাবৃষ্টির কারণে খরা হচ্ছে। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য বৃষ্টি দান করেন'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন। অতঃপর আমরা ঘরে পৌঁছার পূর্বেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলো, যা পরবর্তী জুমা পর্যন্ত লাগাতার বর্ষণ হতে লাগলো। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, "পরবর্তী জুমায় সেই সাহাবী অথবা অপর কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, যেন তিনি এই বর্ষণ বন্ধ করে দেন"। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশের এলাকায় বৃষ্টি হোক। আমাদের এলাকায় না হোক"। তখন আমি দেখলাম যে, মেঘমালা ডান ও বামদিকে সরে গিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগলো এবং মদিনাবাসীদের উপর থেকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো"।"

ছয়. সৈয়্যদুনা হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কাশেফুল কুরুবাত:
সৈয়্যদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা সৈয়্যদুনা হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলে নবীজি এতবেশি কেঁদেছেন যে, আর কখনো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতবেশি কাঁদতে দেখা যায়নি"। সৈয়্যদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, "সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈয়্যদুনা হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জানাযা কিবলার দিকে রেখে অঝোরে কান্না করতে লাগলেন। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান্না থামলো তখন সৈয়্যদুনা হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে সম্বোধন করে এরশাদ করতে লাগলেন,
"হে হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু! হে আল্লাহর রাসুলের চাচা! হে আল্লাহর সিংহ! হে হামযা!

হে কল্যাণকামী! হে কষ্টসমূহ বিদূরিতকারী! হে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহেরার হেফাযত ও সংরক্ষণকারী! এভাবে তিনি হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা তায়ালা আনহুকে সম্বোধন করলেন।"
(আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়াঃ ১/২১২)

উপর্যুক্ত হাদিসে পাকে একজন ওফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে (হে কষ্ট বিদূরিতকারী!) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই বাক্যগুলোর মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু সালেহীন বান্দাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা বৈধ সাবস্থ্য করেননি, বরং যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হবে তাঁর সাহায্য নেওয়াও বৈধ করেছেন।

উপসংহার:
পরিশেষে বলতে পারি, মহান নবী-রাসুলগণ তাঁদের উম্মতদেরকে হেদায়তর পথে আহবানের পাশাপাশি বিভিন্ন জটিল সমস্যা ও কঠিন রোগের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আধুনিক চিকিৎসা করেছেন, যা উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে। আর নবী-রাসুলগণ, আউলিয়ায়ে কেরামগণ আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মানুষের বিপদ-আপদে সাহায্য করতে পারেন। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা। এটা তাঁদের উপর মহান রাব্বে কায়েনাতের দয়া। যা তিনি নবি-রাসুলগণকে মুজিজা হিসেবে এবং আউলিয়ায়ে কেরামদেরকে কারামত হিসেবে প্রদান করে থাকেন। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মুজিজা ও কারামতের মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে বৈধ ও আল্লাহর পক্ষ হতে উম্মতের জন্য নিয়ামতও বটে। আল্লাহপাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন, আমিন; বেহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

লেখক:
আরবি প্রভাষক,
চরণদ্বীপ রজভীয়া ইসলামিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
এমফিল গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর শরাব পান প্রসঙ্গে একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা (দ্বিতীয় পর্ব)

হাসান মুহাম্মদ কফিলুদ্দীন

এবার আসা যাক আমরা শানে নুযূল হিসেবে কোনটি গ্রহণ করবঃ
প্রথমেই আসা যাক, যে কোনো বর্ণনায় অসামাঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনার পাশাপাশি যদি সামাঞ্জস্যপূর্ণ ও সমালোচনাবিহীন বর্ণনা থাকে তাহলে আমরা কোন বর্ণনাগুলো অগ্রাধিকার দিব। এক্ষেত্রে সকলেই একমত যে, অবশ্যই সামাঞ্জস্যপূর্ণ ও সমালোচনাবিহীন বক্তব্যই অগ্রাধিকার পাবে।

তাই আমরা সুরা নিসার ৪৩নং আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথমেই মাওলা আলী কঃ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো থেকে বেরিয়ে আসব। কারণ-
ক) এই বর্ণনাগুলো সহীহ সনদে বর্ণিত হলেও মতন বা হাদীসের মূল কথায় সামঞ্জস্যতা নেই।
খ) এই বর্ণনাগুলোর অধিকাংশেরই বর্ণনাকারী এক। কিন্তু মতনে ভিন্নতা আছে।
গ) এক বর্ণনায় আছে, মাওলা আলি (কঃ) ইমামতি করেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) ইমামতি করেছেন। অন্য বর্ণনায় অমুক সাহাবী বলে উল্লেখ আছে। নির্দিষ্ট কারও নাম নেই।
ঘ) মাওলা আলী (কঃ) থেকে যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সেটিতে মাওলা আলী (কঃ) স্পষ্ট করেই বলেছেন যে অন্য সাহাবী ইমামতি করেছেন। অর্থাৎ, তিনি ইমামতি করেননি। আর একই হাদিস থেকে এ কথাও স্পষ্ট যে, আমন্ত্রিত সাহাবাদের সকলেই শরাব গ্রহণ করেননি।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শানে নুযূল হিসেবে মাওলা আলী (কঃ) সংক্রান্ত হাদিস শরীফগুলো এবং সাহাবা কেরামগনের কারো ইমামতি করা এবং সেটিতে ভুল পড়া সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো একটি অপরটির সাথে অসামাঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া এসব বর্ণনায় মাওলা আলী (কঃ) এঁর মত আযীমুশশান সাহাবীর ব্যাপারে সমালোচনামূলক বক্তব্য পাওয়া যায়, যা যথেষ্ট অসামাঞ্জস্যতাপূর্ণ। তাই এই সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো শানে নুযূল হিসেবে গুরুত্ব রাখলেও প্রচার ও বর্ণনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার না পাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

এবার আসা যাক বাকি বর্ণনাগুলো সম্পর্কে। এ বর্ণনাগুলোও সহীহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত ও সমালোচনামুক্ত। তাছাড়া এই বর্ণনাগুলোও প্রায় সকল তাফসীর গ্রন্থে মুফাসসীরীন কেরামগণ লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাচীন কিতাব হতে শুরু করে আধুনিক তাফসীর গ্রন্থেও এসব বর্ণনাগুলোই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে।

তবে এবার সমাধানের দিকে নজর দেওয়া যাক।
উত্তম সমাধান হল, সনদ সহীহ হলেও মাওলা আলী (কঃ) ও হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)-সহ নাম না জানা সাহাবীর শরাবের প্রভাবে ইমামতি করা এবং ক্বেরাত ভুল পড়া সংক্রান্ত হাদিসগুলোর ক্ষেত্রে চুপ থেকে একই ঘটনা সম্পর্কিত অন্য কোন বর্ণনা আছে কি-না সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

তবে আমাদের হাতে আর কী বিকল্প আছে, সেদিকে দৃষ্টি দিই।

ক- মুসআব বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত হাদিসটিতে দেখা যায়, হযরত মুসআব বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই বলেছেন যে তাঁর কারণেই উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তিনি একদিন অন্যান্য আনসার ও মুহাজির সাহাবাগণসহ এক মজলিশে ছিলেন। সেখানে খাবার গ্রহণের পর শরাব পান করা হয়। আর এতে নেশায় আচ্ছন্ন অবস্থায় একে অপরের সাথে ঠাট্টা-মশকরামূলক আচরণ করা হয়। মুসআব বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাক নিয়েও একজন সাহাবী ঠাট্টা করেন, যা মানানসই ছিলো না। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। এই হাদিসটি গ্রহণযোগ্য সনদে ও গ্রহণযোগ্য ভাষাতেই তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে অন্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

খ- হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কিত বর্ণনাটিতে দেখা যায়, প্রথমবারের মত শরাবের ব্যাপারে আয়াত নাযিল হলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শরাব সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। এতে সুরা নিসার আয়াতটি নাযিল হয়। এরপরেও তিনি আবারও একই প্রার্থনা করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে শরাব সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

গ- প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে তিনি বলেন, শরাব সংক্রান্ত প্রথম আয়াত নাযিল হবার পরও অনেক সাহাবী শরাব পান করে নামাজে উপস্থিত হতেন। তাই নামাজে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় উপস্থিত না হতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। এখানে তিনি কোন ঘটনা বর্ণনা করেননি। শুধুমাত্র কারণ হিসেবে সাহাবা কেরামগণের শরাব পান করে তার ঘোর না কাটা অবস্থায় নামাজে উপস্থিত হবার কথাটি বলেছেন। তাই এই হাদিসে কারও শরাব পান করা, ইমামতী করা ও ক্বিরাতে ভুল পড়ার মত কিছু পাওয়া যায় না। যে কারণে সাহাবা কেরামগণের সমালোচনামূলক তথ্য থেকেও তা মুক্ত।

এই সকল রেওয়ায়াতই উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে যথেষ্ট। বিতর্কে পূর্ণ রেওয়ায়াত গ্রহণ না করে এগুলো হতেই গ্রহণ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বিরোধপূর্ণ, অসামাঞ্জস্যপূর্ণ, ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, বিভেদ-বিভেজ্য তৈরী করে এমন রেওয়ায়াত থেকে বের হয়ে যাওয়াটাই উত্তম। এতে সামাজিক বিভেদ থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়, আবার সাহাবা কেরামগণের সমালোচনা বা সাহাবা কেরাম সম্পর্কিত আলাপ আলোচনা থেকেও মুক্ত থাকা যায়।

এছাড়া আয়াতের কথার সাথে তথা "নেশা, হুঁশ, কী বলছে তা না জানা পর্যন্ত নামাজের ধারে-কাছে না যাওয়া"-এ সমস্ত অংশগুলো পর্যালোচনা করলে হযরত মুসআব বিন সা'দ (রাঃ) সংশ্লিষ্ট বর্ণনাটি বেশি কাছাকাছি। কারণ এতে সাহাবাগনের শরাব পান, হুঁশ হারানো, একে অপরের সাথে খারাপ আচরণের কথা বিদ্যমান।

আবার তেমনিভাবে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদিসটিও কম কাছের নয়। কারণ কিছু-কিছু সাহাবাগণের শরাব পান করে নামাজে আসার সাথে আয়াতে কারীমার মিল আছে।

তবে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সকলের বোঝার সুবিধার্থে গণহারে সবার নিকট যদি উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে একটি বর্ণনার দিকে এগুতে হয়। এক্ষেত্রে হযরত মুসআব বিন সা'দ (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত শানে নুযূলের চাইতে হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কিত বর্ণনাটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যুক্তিসম্মত। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানের বাহিরে সাধারণের নিকট প্রচারের ক্ষেত্রে একটি শানে নুযুলই যথেষ্ট। সাধারণ মানুষের তাহক্বীকের ক্ষমতা নেই। পর্যালোচনার শক্তি নেই। বলা যায়, প্রয়োজনই নেই। গবেষণা করে উত্তম সমাধান বের করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি গবেষকদের কাজ। মুজতাহিদগণের কাজ।

এক্ষেত্রে তিনটি রেওয়ায়াতকে যদি এক জায়গায় আনা হয় তবে এখানে সাহাবাগণের শানের ক্ষেত্রে ওমর (রাঃ) সংশ্লিষ্ট বর্ণনাই প্রধান শানে নুযূল হিসেবে সর্বসাধারণের নিকট প্রচারযোগ্য। কারণ মুসআব বিন সা'দ (রাঃ) সংশ্লিষ্ট হাদিসে ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে সাহাবাগণের শরাবপান করে নামাজে উপস্থিত হওয়া ও শরাবপানের প্রভাবে একে অপরের সাথে খারাপ আচরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। যা সাধারণ মানুষের নিকট প্রকাশ পাওয়া সাহাবা কেরাম-গণের শানের ক্ষেত্রে বিব্রতকর ব্যাপার। যদিও শরাবে আগ্রহী এমন সাহাবাগণের সংখ্যা ছিল কম এবং সে সময়ে শরাবপান হারাম হয়নি। আর এ কারণে শরীয়ত দ্বারাও তাঁদের কোনরূপ ফতোয়ায় আবদ্ধ করা যাবে না।

তথাপি এই বর্ণনা দ্বারা সাধারণ মুসলিমদের অন্তরে সাহাবা কেরামগণের ব্যাপারে তিল পরিমানও ব্যাঙ্গাত্মক ভাবনা যেন না আসে তাই তাঁদের সম্মান রক্ষার্থে এই রেওয়ায়াতগুলো সাধারণের নিকট হতে গোপন রাখাই সুন্দর ও সহজ সমাধান।

পক্ষান্তরে হযরত ওমর রাঃ সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়াত দ্বারা সাহাবাগণের শরাব হতে দূরে থাকার ইচ্ছা, শরাবের খারাপ প্রভাব হতে আল্লাহর নিকট বেঁচে থাকার দোয়া করার বর্ণনা পাওয়া যায়। এতে সাধারণ মুসলিমের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাছাড়া এতে সাহাবাগণের শান-মান প্রকাশ পাচ্ছে, খারাপ হতে বেঁচে থাকার অভিলাশ জানা যাচ্ছে বিধায় এই রেওয়ায়াতটিই সাধারনের জন্য সর্বাধিক গ্রহনযোগ্য এবং বই-পুস্তকের মাধ্যমেও প্রচারযোগ্য।

অতএব, আমরা সুরা নিসার ৪৩নং আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে কোনটি সর্বাধিক গ্রহনযোগ্য এবং সর্বসাধারণের নিকট প্রচারযোগ্য তা পেয়ে গেলাম।

(তৃতীয় পর্ব পড়তে চোখ রাখুন পরবর্তী সংখ্যায়)

লেখক- পিএইচডি (গবেষক), পরিচালক
আল-আমিন ইনস্টিটিউট

আসন্ন অর্থনৈতিক মন্দা ও বাংলাদেশ

শাহবাজ আসাদুল্লাহ

বৈশ্বিক অর্থনীতি বা রাজনীতি নিয়ে যাদের সামান্য হলেও আগ্রহ আছে তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, পুঁজিবাদী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বানিজ্যে যে পরিস্থিতিকে যমের মত ভয় পাওয়া হয় তা হলো মন্দা (recession)। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বাস্তবতায় মন্দা একটা পৌনঃপুনিক ঘটনা, যা মোটাদাগে কয়েক দশক পরপরই দেখা যায়-কখনো তীব্র, কখনো বা সহনীয়। সর্বশেষ এমন ভয়াবহ মন্দা হয়েছিলো ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে, আমেরিকায়। এটি সারা বিশ্বে 'এষড়নধষ ঋরহধহপরধষ ঈৎরংরং' নামে বহুল পরিচিত-যার প্রভাব বিশ্বের সকল বৃহৎ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি মন্থর করে দিয়েছিলো। অর্থনীতিবিদদের সাম্প্রতিক ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী বর্তমান বিশ্ব আরো একটি মন্দার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। মূলত এ কারণেই আমরা অত্র সংখ্যায় মন্দা নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পেলাম।

অর্থনীতির ভাষ্যমতে, মানুষ যৌক্তিক (rational) প্রাণী। দৈনন্দিন জীবনে সে তার সিদ্ধান্তগুলো নেয় যৌক্তিকভাবে, লাভ-লোকসানের হিসেব করে। বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে প্রায়শ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত তার একান্ত আয়ত্তের মধ্যে থাকে না। তার সিদ্ধান্ত তার দেশে কী হচ্ছে এবং বহির্বিশ্বে কী হচ্ছে সেসবের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। সে কারণেই ব্যক্তিকে অথবা বৃহৎ অর্থে রাষ্ট্রকে তার গন্ডির বাইরেও বহির্বিশ্বে কী ঘটছে তার ব্যাপারে নজর রাখতে হয়। আর যখন মন্দা দেখা দেয় তখন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া চরমভাবে ব্যাহত হয়, যা তার দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধিকেও হুমকিতে ফেলে দেয়।

আমরা অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্য দিয়ে মন্দার আইডিয়া সহজভাবে বুঝতে চাই। অর্থনীতিতে বানিজ্য চক্র (business cycle) বলে একটা ব্যাপার আছে, যা মূলত একটা ইকোনমির প্রবৃদ্ধির (GDP growth) দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতাকে তুলে ধরে। বিজনেস সাইকেলের দুইটা উপাদান আছে, এক. চাঙ্গা অবস্থা (boom/peak), দুই. মন্দা (recession)।

চাঙ্গা অবস্থায় আমরা দেখতে পাই একটা ইকোনমিতে সবাই চাকরি করছে-বেকারত্বের হার কম, বাজারে ভোক্তা চাহিদা পর্যাপ্ত, সুলভ বিনিয়োগ, স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতি এবং একটা ভারসাম্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক বানিজ্য। কিন্তু, আমরা মন্দার সময় আমরা এর ঠিক বিপরীত চিত্র দেখতে পাই। এ সময় ভোক্তার সামগ্রিক চাহিদা (aggregate demand) আশঙ্কাজনক হারে কমে যায়; সেই সাথে দেখা দেয় বিনিয়োগের ঘাটতি। উৎপাদন কারখানাগুলোতে দ্রব্যের উৎপাদন থাকে না, যার ফলে হয় প্রচুর কর্মী/শ্রমিক ছাঁটাই। দেখা দেয় অসহনীয় বেকারত্বের। পুরো ইকনমি জুড়ে আসে একধরনের স্থবিরতা। আর যেকোন অর্থবছরের একটানা নয় মাস (three quarters) যদি এই স্থবিরতা বিরাজমান থাকে তাহলে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয় মন্দা। সাধারণ অবস্থায় একে বলা হয় প্রবৃদ্ধির স্থবিরতা (stagnation) আর একই সাথে যদি মূল্যস্ফীতিও বাড়তে থাকে তবে বলা হয় Stagflation.

বিজনেস সাইকেলের দিকে তাকালে খুবই আগ্রহোদ্দীপক একটা চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। Almost every boom period is followed by a recession.
প্রতি দুয়েক দশকেই ইকনমির চাঙ্গাভাবের পর একটা রিসেশন চোখ রাঙাতে থাকে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এ এক বিশাল ধাঁধা, যার হিসেব মিলাতে ঝানু-ঝানু অর্থনীতিবিদেরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। মন্দাকে আমরা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম দুর্বলতা হিসেবেও চিহ্নিত করতে পারিঃ "Recession is the Achilles' heel of the capitalist economic system".

মন্দা হবার পেছনে প্রধান কয়েকটি কারণ হলোঃ
(১.) অনিশ্চয়তা (uncertainty); সাধারণত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী অথবা আন্তদেশীয় যুদ্ধের কারণে পুরো ইকোনমিজুড়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে। আর এই অনিশ্চয়তা থেকে ভোক্তা, উৎপাদক ও সরবারহকারী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শুরু হয় (২.) জল্পনা-কল্পনা (speculation) ও নানাবিধ প্রত্যাশা (expectations); মন্দার ক্ষেত্রে এই প্রত্যাশা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আর এই জল্পনা ও প্রত্যাশা থেকে ইকোনমিতে হুট করে ভোক্তার চাহিদা কমে যেতে পারে। এতে যোগানও অনেকাংশে কমে যায়। আর যদি এমন হয় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারীর কারনে আচমকা কৃষিজ ফলন হ্রাস করেছে, যার ফলে খাদ্যশস্যের যোগানও অনেক হ্রাস করেছে, তাহলে এ অবস্থাকে আমরা যথাক্রমে বলি (৩.) Demand shock & Supply shock.

এখন, সাম্প্রতিক সময়ে, সম্ভবত ২০২৩ সাল থেকে, ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়ে ঘটতে যাওয়া যে মন্দার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে, তার প্রধান কারণগুলো পূর্বের হালকা ধাঁচের তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে, আশাকরি, অনেকটাই অনুমান করা যাচ্ছে।

২০২০ সালের মার্চে কোভিড-১৯ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি অনুমিতভাবেই আমূল একটা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে গেছে। বিশ্বের অর্থনৈতিক ভরকেন্দ্রগুলো, যেমন আমেরিকা, ইউরোজোন, চীন, ইন্ডিয়া ইত্যাদিতে দেখা দিয়েছিলো আশংকাজনক ব্যবসায়িক ও কারবারি স্থবিরতা (economic slowdown)। যাই হোক, মহামারীর প্রকোপ কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ইউরেশিয়ান ভূখণ্ডে দেখা দিলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, যা কিনা কৌশলগতভাবে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এতে সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, এমনকি তুরস্কও কৌশলগতভাবে জড়িয়ে পড়লো। এ যুদ্ধের প্রভাব ইউরোপীয় জাতীয় জীবনে এতোই সুদূরপ্রসারী যে ইউরোজোন ইতোমধ্যে একটা মন্দাজনক পরিস্থিতিতে পতিত হয়েছে। রাশিয়ার গ্যাস পশ্চিম ইউরোপের বসতবাড়ি, কলকারখানাকে সচল ও গরম রাখে। ইউক্রেন হলো বিশ্বের সবচে বড় গম রপ্তানিকারক। যুদ্ধের রাশ টানতে পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষ থেকে রাশিয়ার উপর নেমেছে হরেক রকম নিষেধাজ্ঞা ও স্যাংশনের খড়্গ। এসব স্যাংশনের প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়া আবার রুশ মুদ্রা রুবল ব্যতীত অন্য মুদ্রায় গ্যাস বিনিময় দিয়েছে বন্ধ করে এবং ইউক্রেন থেকে গমবাহী মাদার ভেসেলগুলো (বড় জাহাজ) বহুদিন বন্দর ছেড়ে যেতে পারেনি রুশ কামানের মুখে। এতে পশিম ইউরোপ পড়েছে মহা ফাঁপরে। রুবলের বিনিময়ে গ্যাস নিলে পুতিন শক্তিধর হয়ে ওঠবে, অন্যদিকে পুতিনের গ্যাস ছাড়া চলছেও না। যার ফল দাঁড়িয়েছে, ইউরোজোনজুড়ে কৃষিজ পণ্য

উৎপাদন ও সরবরাহে দেখা দিয়েছে গভীর হ্রাস ও বিশৃঙ্খলা (food supply-chain disruption), মূল্যস্ফীতি স্মরণকালে সবচে বেশি হয়েছে, নাগরিকদের দেয়া হচ্ছে কঠোর সংযমের নির্দেশনা (Austerity measures), এবং এর প্রভাব পড়েছে বিশ্বব্যাপী।

আমেরিকার বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী, মূল্যস্ফীতি উর্ধ্বমুখী, বেকারত্ব বাড়ছে। একই চিত্র চায়না ও ইন্ডিয়ায়। চায়না তো কোভিড চলাকালীন সময় থেকেই নিম্নমুখী অর্থনৈতিক সূচকগুলোর (বপড়-হড়সরপ রহফরপধঃড়ৎং) ঘানি টেনে আসছে। আর ইন্ডিয়া মোদীর দ্বিতীয় মেয়াদের শুরু থেকেই স্থবির প্রবৃদ্ধি প্রবণতা ধরে রেখেছে, যা কোভিড-১৯ ও যুদ্ধের ফলে আরো প্রকট হয়েছে। যুদ্ধের শুরুতে পশ্চিমা বেল্ট ঘেষা থাকলেও ইন্ডিয়া বাধ্য হয়ে রুবলের মাধ্যমে রাশিয়া থেকে তেল কিনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

ইতোমধ্যেই শ্রীলঙ্কা, তারও পূর্বে লেবাননের মতো ছোট অর্থনীতির দেশকে চরম আর্থিক ও বানিজ্যিক সংকটে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশেও এমন দেউলিয়াত্বের গুঞ্জন উঠলেও দূরদর্শী অর্থনীতিবদগণ এর বিপরীত হবার ব্যাপারেই আশাবাদী, যদিও বাংলাদেশের সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নেওয়া এবং বাজেটকে কার্যকারিতার সাথে বাস্তবায়ন ও নাজুক খাত (vulnerable sectors) গুলোকে চিহ্নিত করে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন করা দরকার।

বৈশ্বিক মন্দার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কে কেন সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে?

কিছুদিন পূর্বেই আমরা দেখলাম যে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঘাটতির কারণে বাংলাদেশকে আইএমএফ থেকে বেইল আউট (অথবা সরকারি ভাষ্যে 'কৌশলগত সহায়তা') নিতে হয়েছে যার পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার। আর সম্ভবত আইএমএফের এই শর্তসাপেক্ষ লোনের প্রতিক্রিয়ায় আমরা দেখলাম ডিজেল, অকটেন, ও পেট্রোলের অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতি। তাছাড়া সাধারণ গড় মূল্যস্ফীতিও (average level of inflation) ধীরে-ধীরে বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি রেমিট্যান্স এর প্রবাহতে হ্রাস লক্ষ করা যাচ্ছে। সরকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে দেশজুড়ে খন্ডকালীন লোডশেডিং শুরু করেছে।

এখন আমরা যদি আসলে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল গঠনটাকে লক্ষ করি, তাহলে দেখবো যে, এই দেশের অর্থনীতির সফল জ্বালানী হিসেবে কাজ করছে মূলত রেডিমেড গারমেন্টস রপ্তানি ও রেমিট্যান্স। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রধান ক্রেতা হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার ধনী দেশ সমুহ। যদি ইউরোপে মন্দা আঘাত হানে তবে বাংলাদেশের রপ্তানী খাতের জন্য অশনিসংকেত, কারণ বাংলাদেশের রপ্তানী দ্রব্যের আশি ভাগেরও বেশি হচ্ছে এই গারমেন্টস ও টেক্সটাইল। পশ্চিমা ক্রেতারা সংকটাপন্ন মূহুর্তে ব্যয় সংকোচন নীতি অবলম্বন করে অর্ডার দেয়া বন্ধ করে দিলে মূহুর্তের মধ্যে এ দেশের লক্ষ-লক্ষ গার্মেন্টস শ্রমিক বেকার হয়ে যাবে, এবং একইভাবে বহির্বিশ্বে কর্মরত বাঙ্গালী প্রবাসীরাও তাদের চাকরি হারাতে পারে, যা আমাদের রেমিট্যান্স এর প্রবাহকে সংকুচিত করে দেবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন হলেও এখনো আমাদের প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয় এবং বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় এমন অনেক

পণ্যের কাঁচামালও আমাদেরকে আমদানী করতে হয়। অর্থাৎ মোটাদাগে বাংলাদেশ প্রবলভাবে আমদানী নির্ভর (Import Intensive) অর্থনীতি। তাই বৈশ্বিক অর্থনীতির যে কোন বেসামাল অবস্থা বাংলাদেশকেও সমানভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

অতএব, বর্তমানের ও অদূর ভবিষ্যতের পলিসিমেকাররা গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে না পারলে আমরা নিজেদের পায়ের তলার মাটিকে শক্ত করতে পারবো না। আমাদেরকে এমনভাবে পলিসি বাস্তবায়ন করতে হবে যেন কোনভাবেই আমাদের রেমিট্যান্স ও আরএমজি রপ্তানীতে ব্যাঘাত না ঘটে। আমাদেরকে উৎপাদনের কাঁচামাল (raw materials) আনয়নে আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে যথাসম্ভব স্বয়ংসিদ্ধ হতে হবে।

আমাদেরকে এমনভাবে পলিটিকাল ইকনমি বুঝতে ও প্রয়োগ করতে হবে যেন আমরা শুধু ডলারকেন্দ্রিক বানিজ্যের জিম্মি না হয়ে পড়ি, রাশিয়া বা চায়নার সাথে কৌশলগত বানিজ্যিক সমঝোতায় আসার এবং রুবল ও ইউয়ানের মাধ্যমে বানিজ্য করার স্কোপ বাড়াতে হবে যেন যেকোনো মূহুর্তে ডলার সংকটে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে (foreign exchange market) বাংলাদেশের অবস্থান অস্থিতিশীল না হয়ে যায়। সতর্ক ও কার্যকরী পদক্ষেপেই বাংলাদেশ সকল সংকট কাটিয়ে সমতা, প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

বি. দ্র. উক্ত প্রবন্ধের সাথে প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যানগুলো লেখার কলেবর বৃদ্ধি না হওয়ার এবং তথ্যের বাহুল্যে মূল সারকথা ঝাপসা না হওয়ার স্বার্থে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আগ্রহী পাঠকগণ নিম্নে প্রদত্ত 'কী ওয়ার্ড' গুলো ইন্টারনেটে সার্চ করলেই উক্ত পরিসংখ্যানগুলো সহজে দেখে নিতে পারবেন, একইসাথে আপনার অর্থনৈতিক জীবনবোধও সমৃদ্ধ হবে বলে আশা করি।

Key words:
Capitalist economic system, Recession,
Global Financial Crisis 2007-2008,
Economic forecasting,
Rational Human being (Utilitarianism),
Free market economy, Globalization,
Economic well-being, GDP growth,
Consumer demand, Aggregate demand,
Business cycle, Uncertainty,
Speculation & Expectations,
Demand and Supply shocks,
Economic indicators,
Unemployment, Inflation, Remittance,
Import-intensive economy,
Russia Ukraine War, Post COVID19 impact,
Stagnation, Stagflation,
World food supply chain disruption,
Austerity measures, Foreign exchange market.

লেখকঃ শাহবাজ আসাদুল্লাহ।
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আকিদা সুরক্ষার ব্যবস্থাপনাপত্র

মুহাম্মদ আবদুল করিম

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

ব্যক্তির সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূলে ঈমান-ইসলামের পাশাপাশি ধর্মীয় বিষয়ে স্বীকারোক্তি তথা আকিদাকে সবিশেষ বিবেচিত। এর আলোতে দীপ্তি ছড়ায় তার ধর্মীয় তমদ্দুন ও আচার-অনুষ্ঠান। সভ্যতার ভালোমন্দ মান বিচারার্থে ব্যক্তির ঈমান-আকিদা তার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে। আর ইসলামি সভ্যতা বিশেষজ্ঞগণ জ্ঞাত যে, চলমান শতাব্দীগুলো নবীয়ে দো-জাহাঁ সরওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ও তাঁর কালোত্তীর্ণ সাহাবায়ে কেরামের অনুপম চরিত্রের অনুকরণ এবং ধর্মীয় ভাবধারায় তাঁদেরকে পুরোধা হিসেবে মান্য করা হয়। যুগযুগান্তর ধরে অনুসৃত হয়ে আসছেন তাঁরা। তাই, ঈমান-আকিদায় তাঁরা নিখুঁত মাপকাঠি, সত্যের নিখাদ মানদণ্ড। রাব্বুল 'ইজ্জতের ফরমান, "যদি তারা (সাহাবায়ে কেরাম ব্যতিত অন্যান্যরা) তোমাদের (সাহাবায়ে কেরামের) মতো ঈমান গ্রহণ করে, তবে তারা পথদিশা পাবে।" [আল-কুরআন, সূরা বাক্বারা, আয়াত ১৩৭।] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাকিমুল উম্মত মুফতি আল্লামা আহমদ ইয়ার খান নঈমি (রহ.) বলেন, "এ থেকে বুঝা যায়, যার আকিদা সাহাবায়ে কেরামের আকিদার অনুরূপ, সে মুমিন। আর যার আকিদা তাঁদের অনুরূপ নয়, সে কাফির।" [হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমি (রহ.), তাফসিরে নুরুল ইরফান (নিউ সেলোওয়ার বুক এজেন্সি, বোম্বাই), পৃ. ৩২।]

অন্যদিকে রসুলে খোদার (ﷺ) অমীয় কালাম, "...মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহা-বী (যে মতের উপর আমি ও আমার সাহাবায়ে কেরাম অধিষ্ঠিত।)" [ইমাম তিরমিযি (রহ.), সুনানু তিরমিযি, (দারুল ফিকর, বৈরূত, লেবানন), খ. ৪, পৃ. ৩২৩, হা/২৬৪১। ইমাম আবু নুয়া'ঈম ইস্পাহানি (রহ.), হুলিয়াতুল আউলিয়া (দারুল ফিকর, বৈরূত, লেবানন), খ. ৯, পৃ. ২৩৮।]

আকিদার ব্যাপারে 'আকিদা' :

আমল, মাযহাবসহ অপরাপর বিধানের ন্যায় 'আকিদা'র মৌলিক বিষয়াদিতে ব্যক্তিবিশেষের তাক্বলিদ (অজান্তে-অজ্ঞাতভাবে অনুকরণ) ধর্মে বৈধ নয়। অকাট্য দলিল ও দলিলের আকার-ইঙ্গিতে প্রমাণিত বিষয়ই চূড়ান্ত। এ বিষয়ে নতুন করে দলিল উপস্থাপনেরও প্রয়োজন নেই। [সদরুশ শরী'আহ মুফতি আমযাদ আলী আজমি (রহ.), বাহারে শরী'আত (ফরিদ বুকডিপো রেজিস্টার, ৪১২, মিটিয়া মহল, জামে মসজিদ, দিল্লী), খ. ১, পৃ. ২৮।]

রাব্বে কায়েনাতের ইরশাদ, "তারা বললো, আমরা আপন পিতৃপুরুষকে সেগুলোর পূজা করতে দেখেছি। তিনি (হযরত ইবরাহিম আ.) বললেন, নিশ্চয় তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ এবং তোমাদের পিতৃপুরুষও।" [আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৫৩-৫৪।] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে রুহুল বয়ানে রয়েছে, "দলিল-প্রমাণবিহীন শরয়ি' বিষয়ে অপরের অনুকরণ জায়েয; কিন্তু ধর্মেও মৌলিক বিষয় ও আকিদাগত ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞাত অনুকরণ মোটেও বৈধ নয়। [আল্লামা আবুল ফিদা ইসমাইল হক্কি (রহ.), তাফসিরে রুহুল বয়ান, (দারুল ফিকর, বৈরূত, লেবানন), খ. ৫, পারা-১৮, পৃ. ৪৯১।] তাই নিরেট দলিল-প্রমাণ ব্যতিরেকে আকিদায় অযথা অজ্ঞাতভাবে কারো অনুকরণ সর্বনাশ ডেকে আনবে। বিফলে যাবে কষ্টফল।

আকিদা ব্যাধির উত্থান :

ইসলামের সোনালি দিনলিপি পরম্পরায় তরণমান। 'খাইরুল কুরূন' যা নবীজির (ﷺ) সাহাবি ও তাবে'ঈনদের যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। নবীজি (ﷺ) ইরশাদ করেন, "সর্বোত্তম সময়কাল আমি নবীর সময়কাল। এরপর যারা এ সময়কালের সাথে মিলে। এরপর যারা আসবে।" (সহিহ বুখারি শরিফ, দারুল ফিকর, বৈরূত, লেবানন, খ. ১, হা/২৬৫২।) বিদায়লগ্নে বিভ্রান্তির বার্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পাঁয়তারা বাতিল অপশক্তিগুলো!

লেখক-

সাবেক সহ-সভাপতি, যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ

ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

আল্লামা শাহ্ আহ্মাদ নূরানী সিদ্দিক্বী رحمة الله عليه'র ঐতিহাসিক প্রস্তাবনা :

ইরফান যিয়ায়ী

১৯৭৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ক্বায়দে মিল্লাতে ইসলামিয়া ইমাম শাহ্ আহ্মাদ নূরানী সিদ্দিক্বী رحمة الله عليه'র উত্থাপিত প্রস্তাবনার ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংবিধানে দ্বিতীয় সংশোধনী আনা হয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানীদেরকে কাফির ঘোষণা করা হয়।

ইমাম শাহ্ আহ্মাদ নূরানী رحمة الله عليه বলেছিলেন, "পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংবিধানে আছে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার শর্ত, সেই ব্যক্তিকে মুসলমান হতে হবে। কিন্তু মুসলমানের সংজ্ঞা কি সংবিধানে আছে? সংবিধানে মুসলমানের সংজ্ঞা যুক্ত করতে হবে। মুসলমানের সংজ্ঞা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা'র ওয়াহ্দানিয়াতের (একত্বের) প্রতি ঈমান রাখে এবং নবী পাক মুহাম্মাদ মুস্তাফা صلى الله عليه وآله وسلم-কে সর্বশেষ নবী জানে ও মানে। যদি তা না হয় তবে সেই ব্যক্তি মির্যায়ী (ক্বাদিয়ানী)।"

১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন, ক্বায়দে মিল্লাত আল্লামা নূরানী رحمة الله عليه তৎকালীন সরকারী দল ও বিরোধীদল মিলিয়ে ৩৭জন সংসদ সদস্যের দস্তখতসহ একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন, যে প্রস্তাবনায় দাবী করা হয় ক্বাদিয়ানীদেরকে কাফির ঘোষণা করতে হবে এবং এই বিষয়ে সংবিধানে সংশোধন করতে হবে।

ক্বায়দে মিল্লাতে ইসলামিয়া আল্লামা নূরানী رحمة الله عليه'র প্রস্তাবনাঃ

"যেহেতু এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে সর্বশেষ নবী صلى الله عليه وآله وسلم'র পরে মির্যা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানী নিজেকে নবী দাবী করেছে;

এবং যেহেতু তার নবী হওয়ার মিথ্যা দাবী, কোরআনের বহু আয়াতের মিথ্যাব্যাখ্যা এবং জিহাদ (ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ্)-কে রহিত করার অপচেষ্টা- ইসলামের মূলধারার স্পষ্ট অবাধ্যতা; এবং যেহেতু সে মুসলিম ঐক্য ধ্বংস এবং ইসলামকে মিথ্যা প্রমাণের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্টি; এবং যেহেতু মির্যা গোলাম আহমাদের অনুসারী তাকে নবী মানুক অথবা মুজাদ্দিদ মানুক কিংবা ধর্মীয় নেতা মানুক, যেভাবেই মেনে থাকুক না কেনো, সেই অনুসারী ইসলামের সীমারেখা থেকে বের হয়ে গেছে এবং এই ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ'র ইজমা কায়েম হয়েছে;

এবং যেহেতু, তার অনুসারীদেরকে যে নামেই ডাকা হোক না কেনো, তারা মুসলমানদের সাথে মিশে গিয়ে নিজেদেরকে ইসলামের একটি ফিরক্বা দাবী করে প্রকাশ্যে এবং গোপনে তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালাচ্ছে;

এবং যেহেতু, ৬ থেকে ১০শে এপ্রিল ১৯৭৪ তারিখে রাবিতা আল আলাম আল ইসলামী'র পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র মক্কা মুকাররামায় অনুষ্ঠিত ওআইসি'র কনফারেন্সে সারা বিশ্বের ১৪০টি মুসলিম সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন, সে কনফারেন্সে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ক্বাদিয়ানিয়াত ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে একটি ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম- যারা মিথ্যাচার ও প্রতারণাবসত নিজেদেরকে ইসলামের একটি ফিরক্বা দাবী করে, অতএব, জাতীয়

সংসদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হোক, মির্যা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানী'র অনুসারীদেরকে যে নামেই ডাকা হোক না কেনো তারা কাফির, এবং এর জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার জন্য অফিশিয়ালি বিল পাস করা হোক।"

আল্লামা নূরানী رحمة الله عليه উপরোক্ত প্রস্তাবনা সংসদে পেশ করার পর ন্যাশনাল এসেম্বলির স্পিকার সাহেবযাদা ফারুক্ব আলী জবাব দিয়েছিলো, "আপনি খুব হাস্যকর একটা প্রস্তাবনা পেশ করেছেন। কে মুসলমান আর কে কাফির এটা নির্ধারণ করা কখনোই সংসদের কাজ না। এটা মাদ্রাসা কিংবা দারুল উলুমে আলোচনা করার বিষয়। আপনি এমন একটা বিষয় সংসদে কেনো উপস্থাপন করলেন?"

ক্বায়দে মিল্লাত নূরানী رحمة الله عليه তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিক্বার আলী ভুট্টোর সাথে দেখা করলেন। ভুট্টো সাহেবও স্পিকারের সাথেই একমত ছিলেন। আল্লামা নূরানী رحمة الله عليه ভুট্টো সাহেবকে বললেন, "দেখুন, আপনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের সরকার প্রধান। আপনি রাষ্ট্রপ্রধান থাকা অবস্থায় কেউ যদি এসে দাবী করে সেও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্র কি তাকে বিদ্রোহী হিসাবে দেখবে না?" ভুট্টো সাহেব মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন। মাওলানা নূরানী رحمة الله عليه এবার বুঝালেন, "সে ব্যক্তিকে যদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিদ্রোহী হিসাবে দেখা হয়, তবে একই যুক্তিতে খতমে নুবুওয়্যাতের আক্বীদা এটাই যে, সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ মুস্তাফা صلى الله عليه وآله وسلم'র পরে আর কোনো নবী আসা সম্ভব না। কাজেই, কেউ যদি খতমে নুবুওয়্যাত অস্বীকার করে তাকে কাফির ঘোষণা করাও খুব সাধারণ একটা বিষয়।"

এই অকাট্য যুক্তি অস্বীকার করতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো সাহেব, এবং তৎক্ষনাৎ মাওলানা নূরানী رحمة الله عليه'র প্রস্তাবনা সংসদে আলোচনার জন্য অনুমোদন দিয়ে দেন তিনি।
আইনসভার বিধিমালা মোতাবেক প্রথমে ক্যামেরা সেশানে বৈঠক হয়; জাতীয় সংসদের একটা বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় এই বিষয়ে; একাধিকবার বৈঠকে আলোচনা, পর্যালোচনা চলতে থাকে। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে ক্বাদিয়ানীদের একটা শাখা, লাহোরী গ্রুপের নের্তৃবৃন্দ মাওলানা নূরানী رحمة الله عليه'র সাথে দেখা করে, এবং তাঁর প্রস্তাবনা থেকে লাহোরী গ্রুপের নাম বাদ দিতে তৎকালীন ৫০ লাখ রুপী অফার করে।
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ তারিখে আবদুল হাফীয পীরযাদা জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটির সর্বসম্মত প্রস্তাবনা পেশ করেন এবং এর ভিত্তিতে সংবিধানে দ্বিতীয় সংশোধনী আনা হয়। সংবিধানে যুক্ত করা হয়, "ক্বাদিয়ানী গ্রুপ ও লাহোরী গ্রুপ (যারা নিজেদেরকে আহমাদী বলে) কাফির।"

Global Journal of Human Social Science: F Political Science, Vol 15, p. 30, 31 (The Dynamic Role of Mawlana Shah Ahmad Noorani in the Constitution Making of Pakistan)

লেখক-
মুবাল্লিগ

দেশে দেশে মিলাদুন্নবী ﷺ'র নানান আয়োজন

আবু মুহাম্মদ মুশফিক ইলাহী

অন্ধকার দুনিয়া। না, রাতের অন্ধকার না। দিনের আলোতেই ঘোর অন্ধকার সময়ের নাম আইয়ামে জাহেলিয়াহ। যে সময়ে মদ-জুয়া, শিশুহত্যা, নারীহত্যা, ধর্ষণ হয়ে উঠেছিলো নিত্যদিনের ঘটনা। অন্যায়-অনাচার এতটাই স্বাভাবিক ছিলো যে এসব দেখে কেউ অবাক হতো না। এভাবেই অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিলো গোটা দুনিয়া। তখনই দুনিয়াতে এলো এক নুর। যে নুরের আলোতে আলোকিত হলো সারা পৃথিবী। অন্ধকার মানবসমাজ পেয়েছিলো তাদের অভিভাবক; যিনি পথ দেখাবেন, যিনি মুক্তি দিবেন। পৃথিবীর জমিনে সেদিন সিজদা দিয়েছিলো রবের বন্ধু, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, নবীদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। দিনটি ছিলো ৯ মতান্তরে ১২ই রবিউল আউয়াল।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর এই আগমণ কিয়ামত পর্যন্ত মুমিনদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট। প্রিয়নবী নিজেই উনার আগমনী দিনের স্মরণে প্রতি সপ্তাহের সোমবার দিনে রোজা রাখতেন। সাহাবায়ে কিরামের গল্পের বৈঠকে প্রায়শই আলোচনা হতো রাসুলে আরবির আগমণ নিয়ে। উনারাও বারংবার শুকরিয়া আদায় করতেন আল্লাহ পাকের, যিনি নিজের বন্ধুর মাধ্যমে ঈমানের সম্মান দান করেছেন। মদিনার বাদশাহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও নক্ষত্রতূল্য সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণে পরবর্তী যুগে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ নিজেদের মতো করে মাওলিদ উদযাপন করে আসছে। রবিউল আওয়াল মাস এলেই শুরু হয় আনন্দ উদযাপন। ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক হালাল কাজের মাধ্যমে নানাভাবে স্মরণ করা হয় বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে। পৃথিবীর একেকদেশে একেকভাবে এই দিন উদযাপন করে। রাষ্ট্রীয় উদযাপনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পর্যায়েও পালিত হয় এ দিবস। কেউ এই দিনে রোজা রাখে, কেউবা পরিবার নিয়ে ভালো খাবারের আয়োজন করে। কেউবা আবার গরীবের মুখে অন্ন তুলে দেয়। কেউবা প্রিয়জনকে উপহার দেয়। কেউ আবার মাহফিল আয়োজন করে। একেকজন একেকরকম ভালো কাজের মাধ্যমে রাসুলে আরবির জীবনাদর্শকে অনুসরণ করে।

আর্তুগ্রুল-উসমানের দেশ তুরস্ক। অসংখ্য বিশ্ববরেণ্য ওলামাদের জন্মভূমি। তুরস্কে ঈদে মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি পালন করা হয়। মিলাদুন্নবির রাতে তুরস্কের মসজিদে মসজিদে ও বাসা-বাড়িতে নাতে রাসুল পাঠের মাধ্যমে ঈদে মিলাদুন্নবি উদযাপন করা হয়। এমনকি করোনাকালীন সময়েও সংক্ষিপ্ত পরিসরে হয়েছে নানা আয়োজন। ২৮ই অক্টোবর ২০২০ এর সন্ধ্যায় সে দেশের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়ের এরদোয়ান ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত মিলাদুন্নবীর মাহফিলের ভিডিয়ো টুইট করে ভার্চুয়ালি মিলাদুন্নবি উদযাপন করেন; যে ভিডিয়োতে তিনি নিজেই বিখ্যাত তুর্কি কবি আলি উলভি কুরুচুর লেখা নাতে রসুল আবৃত্তি করছিলেন।

সাহারা মরুভূমি জুড়ে থাকা রাষ্ট্র তিউনিসিয়া। তিউনিসিয়ায় ঈদে মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে রয়েছে জাতীয় ছুটি। এ দিনে স্কুল, ব্যাংক এমনকি বেশিরভাগ ব্যাবসায় প্রতিষ্ঠানও বন্ধ থাকে। তিউনিসরা সাধারণত এ দিনে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী মিলে উৎসবের আমেজে মিলাদুন্নবি

করে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর মিলাদের সময়কার ঘটনা আলোচনা করে। মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে তিউনিসিয়া বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হয়, যা আসিদাহ যাগুগু (عصيدة الزقوقو- অংংরফধঃ তমড়ঁমড়ঁ) নামে পরিচিত। যা পাইন, ময়দা, ক্রিম ও বাদাম দিয়ে তৈরি হয়। [সূত্র- উইকিপিডিয়া]

হযরত মুসা (আ) এঁর স্মৃতি বিজড়িত নীল নদের দেশ মিশর। মিশরে গুরুত্বের সাথে ঈদে মিলাদুন্নবি উদযাপিত হয়ে থাকে। সে দেশের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব শায়খুল আজহার ও গ্র্যান্ড মুফতি উভয়েই মিলাদুন্নবি উদযাপনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। মাওলিদ উপলক্ষ্যে মিশরীদের মধ্যে উৎসব ও আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৯ সালে আল আজহারে সালেহ আল-জাফরী মসজিদ থেকে জামালিয়া এলাকায় আল আজহার প্রধানের কার্যালয়ে অভিমুখে র‍্যালি তথা জুলুস করে ঈদে মিলাদুন্নবি উদযাপন করা হয়। ২০২০ সালের করোনাকালীন সময়েও রাষ্ট্রীয়ভাবে রাষ্ট্রপতি, শায়খুল আজহার, গ্রান্ড মুফতি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় রাজনৈতিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব উপস্থিতিতে মিলাদুন্নবি উদযাপন হয়েছে।

ইলম চর্চার আরেক কেন্দ্র ইয়ামেন। ইয়েমেনের বিভিন্ন অঞ্চলে ঈদে মিলাদুন্নবি উদযাপনের ভিন্ন-ভিন্ন ঐতিহ্য রয়েছে। তবে সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ মিলাদুন্নবি উদযাপন হয় পশ্চিমাঞ্চলে। সেখানে মিলাদুন্নবিকে বলা হয় ঈদে লাইলাতিন নূর। এ রাতে ইয়েমেনের সর্বস্তরের মানুষ মসজিদে একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর জীবনী আলোচনা, খাবার বিতরণ করে থাকে।

২০১৭ সালে সৌদি আরবে প্রথম বারের মতো পবিত্র ১২ রবিউল আউয়াল উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করেছেন বাদশাহ সালমান। [সূত্রঃ কালের কণ্ঠ, আল-আরব আল-ইয়াওম' পত্রিকা ও 'সৌদি ৩৬৫ ডটকম] পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীনে মুসলিমরা সংখ্যালঘু। সে চীনেও মাওলিদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে রবিউল আওয়াল এলেই। ২৬ই জুলাই ২০১৩ সালে প্রথম আলোতে "চীনে, হুই মুসলমানদের সঙ্গে" শীর্ষক শিরোনামে একটি রিপোর্ট আসে। যেখানে লেখক বলেন, "তবে ফুটপাতের ওপর কিছু দোকানের পসরা দেখে বুঝতে বাকি নেই যে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কল্যাণে এখানে আজকের জন্যই এই বাজারের আয়োজন। একটি দোকানে দেখলাম বিকোচ্ছে হালুয়া। বিভিন্ন রঙের সেই হালুয়া। আছে মোরব্বা ও খোরমা খেজুরও। খেজুর চীনের খাবার নয়। যেহেতু হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এঁর জন্মদিন, সে কারণে মিষ্টিমুখ করতেই হয়তো এসব খেজুরের আমদানি হয়েছে এখানে।

ভারত ও পাকিস্তানের মুসলিমেরাও এই মাসকে আনন্দ উদযাপন ও শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে অতিবাহিত করে। মুসলিমদের প্রতিটি গ্রামে-গ্রামে আয়োজিত হয় নানারকম মাহফিল। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়, যা জুলুস নামে প্রসিদ্ধ। সোশ্যাল ভিডিয়ো সাইট ইউটিউব সার্চ করলে যার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধর্মপ্রাণ মুসলিমের দেশ বাংলাদেশ। এদেশে মাওলিদ আয়োজনের ইতিহাস প্রাচীন। এদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মাওলিদ উপলক্ষ্যে অসংখ্য নাত লিখেছেন। যার মধ্যে- "ত্রিভূবনের প্রিয় মুহাম্মদ" খুবই জনপ্রিয়। সারাবছর জুড়ে বাংলাদেশের সবখানেই এই নাত শোনা যায়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুফিয়া কামাল, শওকত উসমান, সৈয়্যদ আলী আহসান সহ অনেকের লেখাতেই মিলাদুন্নবি উদযাপনের ইতিহাস পাওয়া যায়। [বইসই প্রকাশিত বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক পাটাতনে মিলাদুন্নবী] রাসুলে পাকের বংশধর আল্লামা তৈয়্যব শাহ (রহ) এদেশে জশনে জুলুসকে প্রতিষ্ঠা করেন। যা বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জশনে জুলুস। বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের এই জুলুসে প্রতিবছর প্রায় ৬০-৭০ লাখ মানুষের জমায়েত হয়। যা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বোচ্চ। একইদিনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে জুলুস বের করা হয়। এসময় কোরান তিলাওয়াত, নাত পাঠ, মিষ্টান্ন খাবার বিতরণ করা হয়। এই দিন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় প্রধান বিবৃতি দিয়ে থাকেন।

এভাবে সারাবিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোটি-কোটি মুসলিম রবিউল আউয়ালে নিজেদেরকে জাগিয়ে তুলে সিরাতের আলোতে, মাওলিদের অনুপ্রেরণায়। নানা আয়োজনে স্মরণ করা হয় রহমতুল্লিল আলামিন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে। অল্পসংখ্যক ব্যক্তি এজাতীয় আয়োজনের বিরোধীতা করলেও বিশ্বব্যাপী মাওলিদ আয়োজন স্বীকৃত, এবং দিনদিন তা আরো বেশি আড়ম্বর হচ্ছে।

লেখক,
কার্যনির্বাহী সদস্য,
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা, কেন্দ্রীয় পরিষদ।

নারী অধিকার ও রাসুল (ﷺ)

সাবিনা চৌধুরী

আসমান ও জমিনের মালিক মহান আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে আশরাফুল মাখলুকাত' খ্যাত মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যুগে-যুগে অনেক নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির মহান শিক্ষক এবং আল্লাহর নাযিলকৃত আসমানি কিতাবের বিধান অনুযায়ী মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার পথপ্রদর্শক। নিশ্চয়ই নবী-রাসুলগণ ছিলেন আল্লাহর বাছাইকৃতদের মধ্যে সর্বত্তোম এবং আল্লাহ্ তাঁদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় মানবজাতির অগ্রদূত, নারীজাতির মুক্তিদূত, আল্লাহর প্রিয় হাবিব, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ﷺ) প্রেরিত হন শেষ নবী ও রাসুল হিসেবে এবং তাঁর উপর নাযিল করেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব 'আল-কোরআন'। রাসুল (ﷺ) তাঁর সমস্ত জীবদ্দশাজুড়ে মানবজাতির কল্যাণ, ন্যায়-ইনসাফ ও মুক্তির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তিনিই মুহাম্মদ (ﷺ) যিনি সর্বপ্রথম নারীদের পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহারের ব্যাপারে সদা সজাগ ছিলেন রাসুল (ﷺ)। আর ইসলামই একমাত্র নারীদের মর্যাদার স্থান দিয়েছে, যা আগে কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে বহু সভ্যতা ও সমাজের আবির্ভাব হলেও কোনো সভ্যতা, সমাজ নারীদের এতো মর্যাদা দেয়নি। নারীদের মনে করা হতো অশুভ শক্তির প্রতীক। সকল প্রকার খারাপ কাজ, যথা - বেহায়াপনা, অন্যায়- অত্যাচার, পাপ-পঙ্কিলতা, অশ্লীলতা, শয়তানিসহ যাবতীয় কুকাজের জন্য নারীদের দায়ী করা হতো।

গ্রিক সমাজে নারীদের শয়তানের প্রতিমূর্তি মনে করা হতো। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, "নারী হলো বিশ্বের বিকৃঙ্খলা ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস"। গণতন্ত্রের সুতিকাগার খ্যাত প্রাচীন রোমান সভ্যতায় নারীদের বুদ্ধিহীন বিবেচনা করা হতো, যার অজুহাতে তাদের সবরকম নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো। নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করাটা অযোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মনে করা হতো।

ফ্রান্সে নারী, শিশু ও মানসিক ভারসাম্যহীনদের (পাগল) অধিকারহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বিবেচনা করা হতো।

হাম্বুবারী আইন পুরুষের কর্তৃত্বের দোহায় দিয়ে নারীদের উপর অমূলক ও চরম শাস্তির ব্যবস্থা বহাল ছিল।

জাহেলী যুগে আরব সমাজে মেয়ে সন্তানকে অশুভ মনে করা হতো। এজন্যে জন্মের পরই কেউ জানার আগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুতে ফেলা হতো।

ব্রিটিশ আইনে স্বামীর স্বীকৃতিতে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার বিধান ছিল।

চীন সভ্যতায় দুঃখের প্রসবণ (মানসিক পূরণার্থে কোন স্থানে হত্যা দেয়া) বস্তু হিসাবে নারীকে ব্যবহার করা হতো। তাদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হতো।
ইহুদি সমাজে 'নারী অভিশপ্ত', 'তারা মৃত্যুর চেয়ে ও বেশি মারাত্মক' বলে বিবেচিত হতো। নারীদের সেবিকা মনে করা হতো। পিতা প্রাপ্ত কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যাকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার রাখতো।

খ্রিষ্ট সমাজে নারীকে শয়তানের সন্তান মনে করা হতো। জনৈক যাজক বলেন, "নারী হলো এক অনিবার্য আপদ। এক লোভনীয় আপদ। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকিস্বরূপ। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা"।

প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুসমাজে দেবতার খুশির উদ্দেশ্যে কৃষি ও ভালো ফসল ফলানোর জন্য নারীকে বলি দেওয়া হত। সতীদাহ প্রথার নামে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে জীবন্ত আগুনে মৃত স্বামীর সাথে জ্বালিয়ে পুড়ে মারা হতো।

উপরের তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত যে ইসলামপূর্ব যুগ ও অন্যান্য ধর্মে কোথাও নারীকে ন্যূনতম মর্যাদা দেয়া হয়নি। অথচ আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে রাসুল (ﷺ) আরব জাহেলী যুগে নারীর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান, মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে নারীজাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে যে ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিলেন তা শুধু তদানীন্তন সময় নয়, বরং আধুনিক বিশ্বকেও বিমুগ্ধ করে দেয়। রাসুল (ﷺ) বলেন, "যে ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম হয় সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা নাযিল হয়"। তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান আছে, যাদের সে লালন পালন করে এবং তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব"। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, "যে আল্লাহর রাসুল! যদি দুটি মেয়ে থাকে?" নবীজি বললেন, "দুটি থাকলেও"(বুখারি :২৪৮১)। পবিত্র কোরআনে একটা বৃহৎ সুরার নাম 'নিসা' রাখা হয়েছে, যা নারীদের সম্মানিত করেছে। নারীদের মানবিক উন্নতি ও প্রগতির আসল বুনিয়াদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত ঘোষণা করে ইসলাম নারীজাতিকে সর্বত্তোম মর্যাদায় ভূষিত করেছে, যা পুরুষকে দেয়া হয়নি। এই সম্মান নারীজাতিকে মহিমান্বিত করেছে, যা অন্য কোন ধর্মে নজির নেই। পারিবারিক জীবনে সংসার পরিচালনায় নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য থাকলেও সার্বিক মূল্যায়নে নারীজাতিকে পুরুষের চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করা হয়েছে। ইসলামে একজন নারী পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি শ্রদ্ধা ও মান-মর্যাদার অধিকারী। স্ত্রীর প্রতি সম্মান জানাতে রাসুল (ﷺ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম" (তিরমিযি)।

সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করতে কোরআনে পাকে ঘোষণা করেন, "আর মেয়েদেরও ধন-সম্পত্তিতে কমবেশি অংশ রয়েছে" (সুরা নিসা, আয়াত-৭)। আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোরআনে পাকে ঘোষণা করা হচ্ছে, "স্ত্রীদের মোহরানা ফরজ মনে করে আদায় করো।" (সুরা নিসা, আয়াত-৭)।

পূর্বোক্ত তথ্য থেকে এটাই স্পষ্ট যে রাসুল (ﷺ) ছিলেন নারী জাগরণের দিশারী; নারীকে দিয়েছেন সুউচ্চ সম্মান, বসিয়েছেন মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে। এখানেই শেষ নয়, নারীকে দিয়েছে শিক্ষালাভের অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মতামতের অধিকার, আইনী অধিকার, সম্পত্তি লাভের অধিকারসহ সকল প্রকার বৈধ অধিকার। পনেরো শত বছর পূর্বে রাসুল (ﷺ) নারীদের অধিকার ও মর্যাদার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোনো সভ্যতা আজও প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ইসলাম নারীকে দিয়েছে সম্ভ্রম, সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার। সুতরাং, এটাই প্রতীয়মান যে, আল কোরআন ও রাসুল (ﷺ) এঁর সুন্নাহ'র মধ্যে নারীর কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত।

লেখিকা-
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য, বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

কবিতা

অপরাধ বোধ থেকে

গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির

চলার পথে কত ভুল করেছি
ছোট ভুল, বড় ভুল।
ভাইয়ের সঙ্গে- বোনের সঙ্গে
মা ও বাবার সঙ্গে, স্ত্রী- সন্তানের সঙ্গে
সহপাঠী- সহকর্মী এবং চেনা-অচেনার
সঙ্গে আহা ভুল ! কত ভুল ।
অগণিত ভুল । অযাচিত ভুল।
আজ বেলা শেষের দিকে -এই বোধ থেকে
কষ্ট পাচ্ছি মনে, ছিঁড়ে যাচ্ছে হৃদয়খানি।

আমার চলে যাবার খবরে
রাগ- অভিযোগ মুছে নিও-
হে আহত হৃদয়, মজলুম মন।
ওপারের অনলে আমায় জ্বলতে দিও না।
যাওয়ার আগে ক্ষমার আবেদন রেখে গেলাম
কাছের ও দূরের , চেনা ও অচেনা
প্রতিবেশী আমার।
অপরাধ বোধ থেকে আজ-
চাইছি আমি ক্ষমা, ক্ষমা কর আমায়।

গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির বুড়িচং, কুমিল্লা

পঞ্চেন্দ্রিয় মানব

হাফেজ এস. এম. রেজাউল আলম

ইবাদত করার লক্ষে,
মোদের বানালে মনুষ্য;
আবার আঁখি দিলে দেখতে,
সৃষ্টির আজব দৃশ্য।

শ্রবণের জন্য দু কর্ণ দিলে,
দানের ওয়াক্তে তুমি কর না শর্ত;
ঘ্রাণ নেওয়ার তরে নাসিকা দিলে,
ঘ্রাতব্যের সহজে দুই গর্ত।

জিহ্বা দিয়ে বুঝতে দিলে,
সকল স্বাদের মর্ম;
ত্বক দিয়ে তারে করতে দিলে,
রক্ষার সকল কর্ম।

শিক্ষার্থী:- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা

প্রিয়নবী হজরত (দ.)

আবদুল্লাহ আল ফয়সাল

মরুর বুকে এসেছ তুমি
হয়ে মানব শ্রেষ্ঠ,
দেখিয়েছ তাদের সঠিক পথ
যারা ছিলো পথভ্রষ্ট।
সত্যের জলে ধুয়েছ ভুবন
করিয়াছ পরিশুদ্ধ,
ন্যায়ের কত আনিয়েছ বিজয়
অন্যায় করে রুদ্ধ।
তুমি হলে আশেকে খোদা
স্রষ্টার প্রিয় বন্ধু,
তোমার প্রেমেই দুনিয়া সৃষ্টি
বহমান ফোরাত-সিন্ধু।
মহাপ্রয়াণ এমন মানব
দেখেনি বিশ্ব আর,
তুমিই তো তাই রোজ হাশরে
খুলিবে স্বর্গের দ্বার।
ভুবন মাঝে এনেছ খুশি
দেখিয়াছ ঠিক পথ,
ইসলামের নিশান তুলেছ ধরে
ছুটিয়েছ জয়রথ।
জাহেলি যুগে ইনসাফ এনে
করিয়াছ ইতিহাস,
মর্ত পেয়েছে শান্তির বানী,
বিষাদ করে ত্রাস।
সাম্যতা তুমি ছড়িয়ে দিয়েছো
করে জালিম বদ
অনেক বেশি ভালোবাসি তোমায়
প্রিয়নবী হজরত (দ.)।

আবদুল্লাহ আল ফয়সাল
বাকলিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

সত্যের কাফেলা

মোহাম্মদ মুজিবুল হক

ছাত্রসেনা সত্যের কাফেলা
জন্ম নিলো আশিতে,
ছাত্র জাগরণের ঢেউ উঠলো
এক বোধন বাঁশিতে।

একুশ জানুয়ারির সেই সালে
শপথ নেয় এগারো তরুণ,
সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েম করে
আনবে তারা নবারুণ।

তাদের দেখানো অনুসৃত পথে
ছুটছে সেনানীর দল,
ছাত্র রাজনীতির অহিংস রূপ
ছাত্রসেনাই তার ফল।

চার দশকের পথ পরিক্রমায়
নেই কলঙ্কের দাগ,
তাদের প্রতি জেগেছে আজ
সবার গভীর অনুরাগ।

নবী ওলির পথে নির্ভীক সেনা
দূর্বার গতিতে চলে,
তাদের অদম্য সাহস আসে
ঈমান শক্তির বলে।

তাদের পথের পথিক হতে
এসো নবীন দলে দলে,
দুনিয়া আখিরাত ধন্য হবে
জীবন যাবে না বিফলে।

দপ্তর সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট,
কর্ণফুলী উপজেলা।

সাধারণ জ্ঞান

জানা অজানা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানুন

প্রশ্ন: বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান কোন দেশে?
উত্তর: ভারত।
প্রশ্ন: স্বর্ণ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় দেশ কোনটি?
উত্তর: চীন।
প্রশ্ন: রাশিয়ার বিমান সংস্থার নাম কী?
উত্তর: এরোফ্লোঁ।
প্রশ্ন: হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত সভ্যতা ইতিহাসে কোন সভ্যতা হিসেবে পরিচিত?
উত্তর: সিন্ধু সভ্যতা।
কোন দেশে ট্রেনে চাকরি করে পুলিশের পরিবর্তে রোবট?
উত্তর: জাপান
প্রশ্ন: কনফুসিয়াস কে?
উত্তর: দার্শনিক।
প্রশ্ন: নিউইয়র্ক কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
উত্তর: হাডসন।
প্রশ্ন: কোন পাখী আকাশে ডিম পাড়ে, সে ডিম মাটিতে পড়ার আগেই বাচ্চা হয়ে উড়ে যায়?
উত্তর: হোমা পাখী।
প্রশ্ন: তাহরির স্কয়ার কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: মিশর।
প্রশ্ন: দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী?
উত্তর: মালদ্বীপ।
প্রশ্ন: শেখ সাদী কোন ভাষার কবি ছিলেন?
উত্তর: ফারসি।
প্রশ্ন: পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক কোন ভাষায় কথা বলে?
উত্তর: ম্যান্ডারিন।
প্রশ্ন: ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়?
উত্তর: ১৭৮৯ সালে।
প্রশ্ন: গ্রীনিচ মানমন্দির কোন দেশে অবস্থিত ?
উত্তর: যুক্তরাজ্য।

প্রস্তুতকারক: তৌহিদুর রহমান জুয়েল, অর্থ সম্পাদক বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা। বোয়ালখালী পৌরসভা

সাংগঠনিক বুলেটিন

-বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের জাতীয় কাউন্সিল সম্পন্ন, প্রধান পৃষ্ঠপোষক আল্লামা এম এ মান্নান, চেয়ারম্যান মাওলানা এম এ মতিন, মহাসচিব স উ ম আব্দুস সামাদ নির্বাচিত।
-বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা চট্টগ্রাম মহানগর উত্তরের অনুগামী সম্মেলন সম্পন্ন।
-বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা, শেরপুর জেলা শাখার কাউন্সিল অধিবেশন সম্পন্ন।
-বাংলাদেশ ইসলামী যুবসেনা বোয়ালখালী উপজেলার কাউন্সিল।
-বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা মীরসরাই উপজেলার কাউন্সিল সম্পন্ন।
-বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা বরুড়া উপজেলার অভিষেক ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন।
-বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, যুবসেনা ও ছাত্রসেনা বোয়ালখালী উপজেলার যৌথ উদ্যোগে বর্ধিত সভা সম্পন্ন।
-বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের নব-নির্বাচিত কেন্দ্রীয় পরিষদের অভিষেক সম্পন্ন।
-বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার তৃতীয় সাংগঠনিক স্তরভিত্তিক পরীক্ষা সহগামী পরীক্ষা'২২ এর দ্বিতীয় ধাপের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয়

ভারত সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বাংলাদেশ-ভারত ৭ সমঝোতা স্মারক সই।
পুলিশের নতুন মহাপরিদর্শক হলেন চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন ও র‍্যাবের মহাপরিচালক এম খুরশীদ হোসেন।
এমপি পঙ্কজ দেবনাথকে আওয়ামী লীগের সকল পদ থেকে বহিষ্কার।
এইচএসসি পরিক্ষা শুরু হবে ৬ নভেম্বর।
রাঙ্গাকে জাতীয় পার্টি থেকে অব্যাহতি।
পঞ্চগড়ে নৌকাডুবি : মৃত প্রায় ৬৭।
জাতীয় সংসদের উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর মৃত্যু।
দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খানের মৃত্যু।

সকল ঈদের সেরা ঈদ,
ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)

পবিত্র ঈদ-এ মিলাদুন্নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

উপলক্ষে দেশ ও প্রবাসের
সকলকে জানাই

শুভেচ্ছা

আঞ্জুমানে খোদ্দামুল মুসলেমীন
বৃহত্তর আল-সুয়েক শাখা